[মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ফারূক কর্তৃক সংকলিত
'হুকূকুল মোস্তফা' নামক উর্দু কিতাবের বঙ্গানুবাদ]

হুকূকুল মোস্তফা (সাঃ)

উম্মতের উপর
প্রিয় নবীজীর হক
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

ফকীহুল উম্মত

হযরত মাওলানা মুফতী মাহ্মূদ হাসান গাঙ্গূহী (রহঃ)

[মুফতীয়ে আযম ভারত]

ছদর মুফতী, দারুল উলূম দেওবন্দ

অনুবাদ

মুফতী মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ

মুহাদ্দিস, জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা
খতীব, সিদ্দিক বাজার জামে মসজিদ, ঢাকা

দারুল কিতাব

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

অনুবাদকের গুজারিশ

সৃষ্টিজগতের সর্বোত্তম সৃষ্টি, মহত্তম আদর্শের অধিকারী, সমগ্র মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম পথিকৃৎ, প্রিয়তম রাসূল, পিয়ারা হাবীব হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহ, অবদান ও এহ্‌সান সমগ্র উম্মতের উপর বিশেষত মুসলিম উম্মার প্রতি এত বেশী এত অসংখ্য ও অগণিত যে, এর হক আদায় থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মুক্ত হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। এজন্যে সমগ্র সৃষ্টির উপর বিশেষত প্রত্যেক উম্মতির উপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হক ও প্রাপ্য রয়েছে, সে ব্যাপারে কারও কোনরূপ দ্বি-মত বা শোবা-সংশয় নাই।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের যে সম্পর্ক রয়েছে, তা হচ্ছে— তিনি নবী আমরা উম্মত, তিনি হুকুম-আহকাম দাতা আমরা হুকুম-আহকামের অনুসারী, তিনি ইহ-পরকালের অনুগ্রাহক আমরা অনুগৃহীত, তিনি প্রিয় আমরা প্রেমিক। এর প্রতিটি সম্পর্ক যখন কারও সাথে হয় তখন স্বভাবতই তার বিশেষ হক ও মর্যাদার বিষয় সামনে উপস্থিত হয়ে যায়।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় সত্তার মধ্যে যেহেতু সবগুলো সম্পর্কই সর্বোচ্চ ও পরিপূর্ণরূপে সমাবিষ্ট, কাজেই উম্মতের উপর তাঁর প্রাপ্য হক, অধিকার ও মর্যাদা যে কত উচ্চ ও পরিপূর্ণ পর্যায়ের তা একেবারে সুস্পষ্ট।

এসব হক, মর্যাদা ও মহব্বতের বিষয়াবলী সংরক্ষণ ও আদায়ের ব্যাপারে এরূপ আন্তরিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে, বেশী বেশী অভ্যাস ও আন্তরিকতার কারণে তা স্বভাতগত মহব্বতে পরিণত হয়ে যায়। এর পরেও নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক আদায়ের ব্যাপারে স্বীয় চেষ্টা-সাধনাকে অসম্পূর্ণ জ্ঞান করা উচিত। মূলতঃ তাঁর জন্য যে যতটুকু করবে তার অশেষ ফায়দা সে নিজেই লাভ করবে।

আলোচ্য বিষয়বস্তুর উপর বাংলা ভাষায় স্বতন্ত্রভাবে সবিস্তার এ-ই সর্বপ্রথম গ্রন্থ। মূল রচনা যে মহান ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত তিনি ফকীহুল উম্মত হযরত মাওলানা মুফতী মাহমূদ গাঙ্গুহী (রহঃ)। একাধারে তিনি ফকীহ, মুতাকাল্লিম, মুনাজির, মুহাদ্দিস, মুফাচ্ছির, মুসলিহে উম্মত, মুর্শিদে মিল্লাত,

শায়খুল আরব ওয়াল আজম। যুগ যুগ ধরে তিনি দ্বীন ও ইলমে দ্বীনের খিদমত করেছেন। বিশ্ব বিখ্যাত দ্বীনি ও ইলমী প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দ এবং মাজাহিরে উলূম সাহারানপুর ও জামিউল উলূম কানপুরে দ্বীনের বহুমূখী খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তাঁর অগণিত শিষ্য-শাগরেদ ও ভক্তবৃন্দ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে রয়েছে। তিনি আরবী, ফারসি ও উর্দু ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৃহদাকারের পঁচিশ খণ্ডে লিখিত তাঁর 'ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া' জ্ঞানী-গুণীজনদের মাঝে সুপরিচিত। সম্প্রতি তিনি দ্বীনি দাওয়াতের এক মুবারক সফরে আল্লাহ তাআলার পিয়ারা হয়ে গেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর কবরকে নূরে ভরপুর করে দিন। আমীন।

অত্র পুস্তকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক ও অধিকারসমূহকে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করে সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি হকের পাশাপাশি পবিত্র কুরআনের আয়াত, হাদীসের রেওয়ায়াত এবং সাহাবায়ে কেরামের বাস্তব জীবনে সংঘটিত, শিক্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনাবলী নির্ভরযোগ্য সূত্রের হাওয়ালা সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

সংকলক হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ ফারুক প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থটিই সংকলনের ক্ষেত্রে মক্কা মুকাররমা, মসজিদে হারাম, মকামে ইবরাহীম, মিনা, মুযদালিফা, ময়দানে আরাফাত এবং মদীনা মুনাওয়ারা, মসজিদে নববী, রিয়াজুল জান্নাত, মকামে আসহাবে সুফফা ইত্যাদি বরকতময় ও দোআ কবূলের স্থানসমূহে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটির কবূলিয়তের বিভিন্ন নিদর্শনাদি প্রকাশ পাওয়ার কথাও তিনি ব্যক্ত করেছেন।

অনুবাদ সরল সহজ ও মূলানুগ করার বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। ওয়াকিফহাল মহলের নিকট অবহিতকরণের আশা রইল।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ, অনুকরণ ও মহব্বতের তাওফীক দান করুন। আমীন।

২২ রবীউল আউয়াল ১৪১৮
২৯ জুলাই ১৯৯৭

মুহাম্মদ উবাইদুল্লাহ
জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ
ঢাকা।

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

প্রথম হক
হুযূর আকরাম (সঃ)এর প্রতি ঈমান

দ্বিতীয় হক
আঁ-হযরত (সাঃ)এর এতায়াত ও আনুগত্য একান্ত অপরিহার্য

তৃতীয় হক
হুযূর (সাঃ)-এর সুন্নত, আদত ও স্বভাব-চরিত্রের অনুসরণ

চতুর্থ হক

রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর হুকুম ও সুন্নত তরক না করা

সুন্নত ত্যাগ করলে কঠিন আযাবের ধমকি

পঞ্চম হক

মহব্বতে রাসূল (সাঃ)

ষষ্ঠ হক
রাসূলে করীম (সঃ)–এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

হুকূকুল মোস্তফা (সঃ)

প্রিয় নবীজীর হক

[সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]

প্রথম হক

হুযূর আকরাম (সঃ)এর প্রতি ঈমান

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নুবুওয়ত ও রেসালত যেহেতু কুরআন পাকের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ এবং প্রকাশ্য ও জাজ্জ্বল্যমান মুজেযাসমূহ দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত, তাই তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যেসব হুকুম–আহকাম নিয়ে এসেছেন, সেসব হুকুম–আহকাম ও যাবতীয় বিষয়াবলীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ফরয ও একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِىْٓ اَنْزَلْنَا

"তোমরা আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের উপর এবং যে নূর আমি নাযিল করেছি সেই নূরের উপর ঈমান আন।" (সূরা তাগাবুন)

আয়াত–পাকে 'রাসূল' দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, আর 'নূর' দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে পবিত্র কুরআনকে যা আদ্যোপান্ত পরিপূর্ণ নূর।

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

"আমি আপনাকে সাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শকরূপে পাঠিয়েছি। যাতে (হে মানুষ !) তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর।" (সূরা ফাত্হ)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ۨ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ ۪ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

“আপনি বলে দিন, হে লোকসকল! আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর রাসূল। যাঁর রাজত্ব সমস্ত আসমান-যমিনে, তিনি ব্যতীত আর কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নাই। তিনিই জীবন দান করেন, তিনিই শক্তি দান করেন। অতএব, আল্লাহর উপর, তাঁর উম্মী নবীর উপর ঈমান আন, যিনি ঈমান এনেছেন আল্লাহর উপর, আল্লাহর আহকামের উপর। আর তোমরা তাঁর (নবীর) অনুসরণ কর, তাহলে তোমরা সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।” (সূরা আরাফ)

যারা ঈমান আনবে না তাদের শাস্তি

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ○

“যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনবে না, আমি (এ সমস্ত) কাফেরদের জন্য দোযখ তৈরী করে রেখেছি।” (সূরা ফাত্হ)

এই আয়াত দ্বারা যে বিষয়টি জানা গেল, তা হচ্ছে যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা ফরয, এমনকি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার বিষয়টিও ঐ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান না আনা হবে। অতএব, এরূপ ব্যক্তি কাফের হিসাবেই পরিগণিত হবে এবং এদের জন্যই উপরোক্ত আয়াতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি এ ধরনের লোক অর্থাৎ যারা রাসূলের প্রতি ঈমান আনে নাই, তারা যদি বংশগতভাবে নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করে, তাদের নামও মুসলমানী নাম হয় এবং সরকারী কাগজ-পত্রেও নিজেদেরকে মুসলমান হিসাবে লিখিয়ে থাকে, তবুও তারা কাফের বলেই পরিগণিত হবে। এ বিষয়টি হাদীস শরীফে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيُؤْمِنُوْا بِىْ وَبِمَا جِئْتُ بِهٖ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ (متفق عليه)

“হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে হুকুম করা হয়েছে যে, মানুষ যে পর্যন্ত সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং যে পর্যন্ত আমার প্রতি ঈমান না আনবে এবং যে পর্যন্ত আমার আনীত শরীয়তের উপর ঈমান না আনবে সে পর্যন্ত আমি যেন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকি। আর যখন তারা এগুলোর উপর ঈমান আনবে, তখন তারা নিজেদের রক্ত (প্রাণ) এবং মালকে আমার (যুদ্ধ) থেকে বাঁচিয়ে নিবে। তবে যদি এগুলো হক হিসাবে পাওনা হয়ে যায়, তাহলে ভিন্ন কথা। (যেমন, না-হক কতল করা, বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও জেনা করা ইত্যাদি। কেননা, এসব অবস্থায় হদ্দ জারী করা হবে।) আর তাদের প্রকৃত হিসাব আল্লাহ পাক নিবেন।”

অর্থাৎ লোকেরা যখন এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ তাআলাই একমাত্র মাবূদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল, তখন তাদের সাথে কোন যুদ্ধ নাই। মুখে সাক্ষ্য দেওয়ার পরেও অন্তরে যদি তারা কোনরূপ অস্বীকৃতি রাখে, তবে সেই অন্তরের গোপন বিষয় আল্লাহ তাআলার সোপর্দ ; আখেরাতে আল্লাহ পাক সে অনুযায়ী তাদের সাথে আচরণ করবেন।

অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সিহাহ্ সিত্তাহ্ অর্থাৎ হাদীসের বিখ্যাত ছয় কিতাবের প্রত্যেকটিতে যেটির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) এ হাদীসখানিকে ‘মুতাওয়াতির’ (যে হাদীসের সনদের সকল স্তরেই বর্ণনাকারীদের সংখ্যা এতো বেশী যে, তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা কথা রচনা করা বা বলা স্বভাবতঃই অসম্ভব) বলে আখ্যায়িত করেছেন- হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
فَاِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوْا مِنِّىْ دِمَائَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

"আমাকে হুকুম করা হয়েছে লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকার জন্য–যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। তারা যখন এই সাক্ষ্য দিবে তখন তারা নিজেদের রক্ত ও সম্পদকে আমার (যুদ্ধ) থেকে রক্ষা করে নিবে।" (শরহে শিফা)

অপর এক সনদে উপরের হাদীসখানি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আমাকে লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকার জন্য হুকুম করা হয়েছে–যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সাক্ষ্য না দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল।"
(শরহে শিফা)

এই হাদীসখানি দ্বারাও জানা গেল যে, আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন ব্যতীত আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, আল্লাহর প্রতি ঈমানের অর্থ কি? এ বিষয়টিও খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই জানা যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান রাখে কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে না, কিংবা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক আনীত শরীয়তকে অথবা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ বিষয়াবলীর কোন অংশকে অস্বীকার করে, এরূপ ব্যক্তি কাফের বলেই গণ্য হবে।

রাসূল (সঃ)এর প্রতি ঈমান না আনার উপর কঠোর ভীতি-প্রদর্শন

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসব লোকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করার জন্য হুকুম করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَا يَسْمَعُ بِىْ اَحَدٌ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ يَهُوْدِىٌّ وَّلَا
نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوْتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ اِلَّا كَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ

"হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, পবিত্র ঐ সত্তার কসম যাঁর কুদরতের হাতে আমার প্রাণ—এই উম্মতের মধ্যে যে কেউ—চাই সে ইহুদী হোক কিংবা নাসারা হোক—আমার রেসালতের (রসূল হওয়ার) সংবাদ শুনবে অতঃপর আমার প্রতি এবং প্রেরিত শরীয়তের প্রতি ঈমান না এনে মারা যাবে সে নির্ঘাত জাহান্নামী হবে।" (মিশকাত)

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাত ও নুবুওয়াতের উপর ঈমান আনা যেকোন ব্যক্তির উপর ফরয ও জরুরী। মুহাম্মদী শরীয়ত ত্যাগ করে অন্য কোন মাযহাব কারও জন্য কখনও কিছুতেই যথেষ্ট ও গ্রহণযোগ্য নয়।

'রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান'-এর অর্থ কি?

আল্লাহর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থ হচ্ছে যে, এই মর্মে তাঁর রিসালাত ও নুবুওয়াতকে সত্য বলে একীন ও দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাঁকে মাখলূকের প্রতি নবী ও রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি যে শরীয়ত তথা বিধি-বিধান নিয়ে আগমন করেছেন, সেসব সম্পর্কেও আন্তরিক বিশ্বাস রাখবে যে, এগুলো সব সত্য ও হক এবং আদেশ-নিষেধ যা কিছু তিনি বর্ণনা করেছেন সবই হক ও সত্য। আন্তরিক এ বিশ্বাস ও একীনের সাথে সাথে সে মুতাবেক মুখে স্বীকারও করতে হবে এবং সাক্ষ্য প্রদানও করতে হবে।

আন্তরিক বিশ্বাস অপরিহার্য

হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'ইসলাম' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জওয়াব দিয়েছেন ঃ

اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"আপনি এ কথা সাক্ষ্য দিবেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার রাসূল।"

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের অবশিষ্ট রুকনগুলো (নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযান মাসের রোযা রাখা, সামর্থবান হলে হজ্জ করা) উল্লেখ করেছেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রশ্ন করেছেন ঃ 'ঈমান কি?' জওয়াবে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ

"আপনি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রাসূলগণের প্রতি মনে-প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করবেন।"

(অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পবিত্র সত্তার হাকীকত এবং তাঁর সেফাত তথা গুণাবলীর হাকীকতকে সত্য ও বাস্তব বলে অন্তর থেকে দৃঢ়বিশ্বাস করা, সে সঙ্গে এ বিষয়ের সত্যতাও আন্তরিকভাবে স্বীকার করা যে, ফেরেশতাগণ নেক ও পুতপবিত্র, আল্লাহ তাআলার একান্ত অনুগত ও নিষ্পাপ বান্দা ; তাঁরা পুরুষও নন এবং স্ত্রীলোকও নন। এমনিভাবে আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর ঈমান আনা, অর্থাৎ এসব কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। এবং রাসূলগণের উপর ঈমান আনা, অর্থাৎ আন্তরিকভাবে স্বীকার করা যে, তাঁদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে মাখলুকের প্রতি মাখলূকের হিদায়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে।)

অতঃপর আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য বিষয়—কিয়ামত দিবস, তকদীর ইত্যাদির উপর ঈমান আনার কথা উল্লেখ করেছেন। এ হাদীসখানি হাদীসের বিখ্যাত ছয় কিতাবে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত এ হাদীসখানির মধ্যে যে বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে 'তাছদীকে-কালবী' অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস এবং দৃঢ় ও অটল একীন সুতরাং ঈমানের গ্রহণযোগ্যতার জন্য এ শর্ত একান্ত জরুরী ও

অপরিহার্য। আর এ জন্যেই পবিত্র কুরআনে তা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে—ইরশাদ হচ্ছে ঃ

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِىْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○

"এই গ্রাম্য লোকেরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি ; আপনি বলে দিন তোমরা ঈমান তো আন নাই, বরং বল যে, আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি এবং এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নাই ; আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মান্য কর, তবে আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহ থেকে কিছুমাত্র হ্রাস করবেন না ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। পূর্ণ মুমিন তাঁরাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর এতে সন্দেহ করে নাই, অধিকন্তু স্বীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ দ্বারা আল্লাহর পথে শ্রম স্বীকার করেছে ; বস্তুত তারাই সত্যবাদী।" (সূরা হুজুরাত)

উপরোক্ত আয়াতের দ্বারাও একথা জানা গেল যে, ঈমানের জন্য আন্তরিক বিশ্বাস ও অটল একীন অপরিহার্য। যদি সামান্যতম শোবা-সন্দেহও অন্তরে থাকে, তবে ঈমান সহীহ হবে না, যেমন কুরআনের আয়াতাংশে (অতঃপর এতে সন্দেহ করে নাই) উল্লেখ করা হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতে যেমন 'আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি 'হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের' কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আরও বহু আয়াতে অনুরূপ করা হয়েছে। এতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন ছাড়া ঈমান দুরুস্তই হয় না। আর এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শুধু মুখে স্বীকার করা কিংবা সাক্ষ্য প্রদান করা যথেষ্ট হবে না ; বরং সেই সঙ্গে অন্তরের ভিতর থেকে পূর্ণ বিশ্বাস এবং অটল-অনড় একীনেরও প্রয়োজন রয়েছে, এছাড়া ঈমান মোটেও গ্রহণযোগ্য হবে না। বরং পবিত্র কুরআনে এ ধরনের মুখে উচ্চারণ ও সাক্ষ্য প্রদানকে 'নেফাক' তথা ঈমানের ছদ্মাবরণে কুফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন সূরা 'মুনাফিকুন'-এ ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝

"যখন আপনার নিকট এই মুনাফেকগণ আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে আপনি আল্লাহর রাসূল। একথা তো আল্লাহ জানেন যে, আপনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই মুনাফেকগণ মিথ্যুক।" (সূরা মুনাফিকুন)

এসব লোক কসম খেয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর রাসূল হওয়ার বিষয়টি সাক্ষ্য প্রদান করছে, এতদসত্ত্বেও কেবল এজন্য যে, তাদের অন্তরে এ বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও একীন নাই, তাদেরকে মিথ্যুক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মৌখিক স্বীকৃতি ও সাক্ষ্যের দ্বারা তারা মুমিন হতে পারে নাই, আখেরাতে তাদের পরিণতি কাফেরদের মত জাহান্নাম-ই রয়ে গেছে।

মুনাফিকদের শাস্তি কাফেরদের তুলনায় আরও মারাত্মক হবে

বরং কাফেরদের তুলনায় মুনাফিকদের আযাব ও শাস্তি আরও মারাত্মক ও ভীষণ হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ۝

"নিঃসন্দেহে মুনাফেকগণ দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে নিক্ষিপ্ত হবে এবং আপনি কখনও তাদের কোন সাহায্যকারী পাবেন না।" (সূরা নিসা)

মুনাফিকদের মৌখিক স্বীকৃতি ও সাক্ষ্য এবং বাহ্যিক আনুগত্য ও মান্যতার কারণে ইহজগতে তাদের সাথে যদিও কাফেরদের ন্যায় আচরণ করা হবে না, কিন্তু আখেরাতের আযাব থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তাদের ইত্যাকার ঈমান মোটেও যথেষ্ট নয় ; বরং আন্তরিক বিশ্বাস ও একীন অপরিহার্য শর্ত। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কামেল ঈমানদার হওয়ার তওফীক দান করুন, আমীন।

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

দ্বিতীয় হক

আঁ-হযরত (সাঃ)এর এতায়াত ও আনুগত্য একান্ত অপরিহার্য

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলার নবী ও রাসূলরূপে স্বীকার করে নেওয়া এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন সেসব হুকুম-আহকাম ও শরীয়তের প্রতি আন্তরিক আস্থা ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর স্বভাবতঃই তাঁর আনুগত্য ও এতায়াত একান্ত অপরিহার্য হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ۝

"হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করা থেকে মুখ ফিরিয়ো না।" (সূরা আনফাল)

উক্ত আয়াতের মধ্যে উল্লেখিত 'আনহু'-এর দ্বারা আল্লাহর রাসূলকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এর অর্থ হয়—তোমরা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও এতায়াত থেকে বিমুখ হয়ো না। এরূপ প্রয়োগের মাধ্যমে এদিকে ইশারা করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য—যে আনুগত্যের হুকুম "আল্লাহর আনুগত্য কর" আয়াতের মধ্যে করা হয়েছে। এবং এর প্রমাণ অন্য এক আয়াতে রয়েছে, ইরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করেছে, সে অবশ্যই আল্লাহর আনুগত্য করলো।" (সূরা নিসা)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ

"আপনি বলে দিন, তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।" (সূরা আলি-ইমরান)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۝

"তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, তাহলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে।" (সূরা আলি-ইমরান)

আরও ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۝

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে থাক, রাসূলের আনুগত্য করতে থাক এবং সতর্ক থাক; যদি মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ যে, আমার রাসূলের উপর দায়িত্ব হচ্ছে শুধু পরিস্কারভাবে পৌছিয়ে দেওয়া।" (সূরা মায়িদাহ)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ۗ وَمَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ۝

"আপনি বলে দিন, আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর ; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রাখ, রাসূলের দায়িত্বে ততটুকুই যতটুকু তার উপর বোঝা দেওয়া হয়েছে, আর তোমাদের দায়িত্বে ততটুকু যতটুকু তোমাদের উপর বোঝা দেওয়া হয়েছে। যদি তোমরা তাঁর আনুগত্য করে নাও তবে তোমরা পথপ্রাপ্ত হবে। আর রাসূলের জিম্মায় শুধু পরিস্কারভাবে পৌছিয়ে দেওয়া।" (সূরা নূর)

আয়াতের শানে নুযূল

এ আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحَبَّنِىْ فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهَ وَمَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করলো, সে আল্লাহ তাআলাকে মহব্বত করলো। আর যে আমার অনুগত হয়ে চললো সে আল্লাহ পাকের অনুগত হয়ে চললো।"

এই হাদীস শুনে মুনাফিকরা মন্তব্য করলো যে, অন্যদেরকে তিনি শিরক থেকে নিষেধ করে থাকেন, অথচ এখন দেখছি—আল্লাহর সঙ্গে নিজেকে শরীক করার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দিচ্ছেন, তিনি চাচ্ছেন যে, তাকে রব্ব বানিয়ে নেওয়া হোক যেমন নাসারাগণ হযরত ঈসা (আঃ)কে রব্ব বানিয়ে নিয়েছিল? এরপর আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন। আয়াতের মর্ম হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য আল্লাহ তাআলার আনুগত্য থেকে পৃথক ও ভিন্ন কিছু নয়, সুতরাং এতে কোনরূপ শিরকের সন্দেহ করা যেতে পারে না। যেহেতু হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামই পৌছিয়ে থাকেন —যেগুলোর প্রকৃত হুকুমদাতা খোদ আল্লাহ তাআলা ; কখনও প্রত্যক্ষ ওহীর (কুরআনের) মাধ্যমে আর কখনও পরোক্ষ ওহীর মাধ্যমে (সুন্নাহ) সেগুলো তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাই রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই আনুগত্য।

নিম্নোক্ত আয়াতের দ্বারা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য লাযেম ও অপরিহার্য হওয়া প্রমাণিত হয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ

"রাসূল তোমাদেরকে যা নির্দেশ দেন, তা তোমরা পালন কর আর যা থেকে তিনি তোমাদেকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" (সূরা হাশর)

রাসূলে আকরাম (সাঃ)-এর আনুগত্যকারীর জন্য মস্তবড় পুরস্কার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا۝

"আর যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে তারা ঐসব লোকের সঙ্গে থাকবে যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন অর্থাৎ আম্বিয়া, সিদ্দীকিন, শুহাদা ও সালেহীনের সঙ্গে ; তারা খুবই ভাল সঙ্গী।" (সূরা নিসা)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর এবং তাঁর রাসূলের অনুগত লোকদের জন্য কত বড় পুরস্কারের ঘোষণা করেছেন। আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালাম, ছিদ্দীকিন, শোহাদা, সালেহীনের সাথে জান্নাতে অবস্থান করা, তাঁদের সান্নিধ্যে জান্নাত ভোগ করা বস্তুতঃ কত বড় নেয়ামত ! এই নেয়ামত ও আরাম–আয়েশের উপর জান কুরবান করে দিলেও কিছু নয়। সমগ্র দুনিয়ার সম্পদরাজি ও আরাম–আয়েশ এই নেয়ামতের সামনে কোনই মূল্য রাখে না। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীবের পুরাপুরি এতায়াত ও অনুসরণের তওফীক আমাদের সকলকে দান করুন—আমীন॥

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

"আমি তামাম আম্বিয়ায়ে কেরামকে শুধু এ জন্যে (দুনিয়াতে) পাঠিয়েছি যাতে আল্লাহর হুকুমে (দুনিয়াবাসী) তাদের অনুসরণ করে চলে।" (সূরা নিসা)

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামকে যেক্ষেত্রে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তামাম নবী–রাসূলের সরদার, খাতামুন্নাবিয়্যীন, হাবীবে রাব্বুল আলামীন–এর আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয়টি কত স্পষ্ট, তা বলারই অপেক্ষা রাখে না।

জাহান্নামে কাফেরদের চিৎকার

কুরআন পাকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন বলেছেন ঃ কাফেরদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তারা এই বলে চিৎকার করতে থাকবে ঃ

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِى النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا○

"হায় আফসোস ! আমরা যদি আল্লাহর হুকুম মেনে চলতাম, হায় আফসোস ! আমরা যদি তাঁর রাসূলের অনুসরণ করতাম।" (সূরা আহযাব)

বস্তুতঃ কাফেরদের উক্ত আফসোস সে দিন কোন কাজেই আসবে না। বরং জাহান্নামের আযাব তাদের জন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

জাহান্নামে কাফেরদের আরজ

তারা জাহান্নামের এই যাতনা ভুগতে থাকবে আর দুনিয়ার জীবনে যেসব নেতাদের তারা অনুসরণ করে চলেছিল, তাদের কথা উল্লেখ করে তারা বলতে থাকবে ঃ "হে আমাদের পরোয়ারদিগার ! আমরা আমাদের নেতাদের—আমাদের বড়দের অনুসরণ করেছিলাম ; তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। পরোয়ারদিগার ! আজকে আপনি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দান করুন এবং তাদের উপর লানত বর্ষণ করুন।" (সূরা আহযাব)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا○

"সেইদিন জালেমেরা (অতিশয় আফসোসের চোটে) হাত কামড়াতে কামড়াতে বলবে, হায় আফসোস, কতই না ভাল হতো, যদি আমরা (দুনিয়াতে) রাসূলের অনুগত হয়ে তাঁর দেখানো পথে চলতাম।" (সূরা ফুরকান)

কুরআন পাকের আরও অনেক আয়াতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণের হুকুম উল্লেখ করা হয়েছে। কিতাবের কলেবর বৃদ্ধি না পায় সেজন্য উপরোক্ত কয়েকখানি আয়াতই মাত্র উল্লেখ করা হলো।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণের বিষয় সম্বলিত অসংখ্য হাদীস রয়েছে। নমুনা স্বরূপ আমরা এখানে কয়েকখানি হাদীস উল্লেখ করছি।

আহ্‌লে কুরআন ফের্কা বাতিল হওয়ার প্রমাণ

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

لَا أُلْفِيَنَّ اَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا عَلٰى اَرِيْكَتِهٖ يَأْتِيْهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِىْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهٖ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُوْلُ لَا اَدْرِىْ مَاوَجَدْنَا فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ اتَّبَعْنَاهُ

"আমি তোমাদের কাউকে যেন এমন অবস্থায় কখনও না পাই যে, সে আপন আসনে উপবিষ্ট আছে, এ সময় আমার কোন হুকুম তার কাছে পৌঁছলো যা তার করণীয় কিংবা আমার কোন নিষেধাজ্ঞা তার কাছে পৌঁছলো যা তার বর্জনীয়। অথচ সে বলে দিল—আমি এ বিষয়ে জানি না ; আমি তো কেবল ঐ বিষয়ের উপর আমল করবো যা আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) আমি পেয়েছি।" (মিশকাত)

এই হাদীসের দ্বারা জানা গেল, যারা নিজেদেরকে 'কুরআনের অনুসারী' বলে দাবী করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণকে জরুরী মনে করে না, এইসব লোক প্রকৃতপক্ষে কুরআনের উপরই আমল করে না। বরং হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণকে জরুরী মনে না করার কারণে প্রকৃত প্রস্তাবে নবীর আনুগত্য ও অনুসরণ ফরজ হওয়ার বিষয় সম্বলিত আয়াত–সমূহের প্রতি তাদের অস্বীকৃতি ও অবিশ্বাস প্রমাণিত হয়। ফলে, এসব লোক মুসলমানই নয়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَمَنْ يُّطِعِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ اَطَاعَنِىْ وَمَنْ يَّعْصِ الْاَمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِىْ

"হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহর আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহর অবাধ্যতা করলো। আর যে ব্যক্তি উপরস্থ আমীরের আনুগত্য করলো সে আমার আনুগত্য করলো আর যে ব্যক্তি উপরস্থ আমীরের অবাধ্যতা করলো সে আমার অবাধ্যতা করলো।" (মিশকাত)

আমীরের আনুগত্যের অর্থ ও বিধান

আমীরের আনুগত্যের অর্থ হলো, আমীর যখন আল্লাহ ও রাসূলের বিধান মুতাবেক হুকুম করবে তখন তাকে মান্য করা। আর যদি শরীয়তের খেলাফ

হুকুম করে, তখন তার নির্দেশ মানা জায়েয নয়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অর্থাৎ, "সৃষ্টিকর্তার (আল্লাহর) অবাধ্যতা করতে হয় এমন কোন হুকুম যদি কোন মাখলূক (ব্যক্তি) করে, তবে এ বিষয়ে কোন আনুগত্য নাই।" (মিশকাত)

এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَىْءٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"আমি কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করলে তোমরা অবশ্যই তা থেকে বিরত থাক। আর কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দিলে অবশ্যই তোমরা তা পালন কর।" (বোখারী)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

كُلُّ اُمَّتِىْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ اَبٰى قَالُوْا وَمَنْ اَبٰى قَالَ مَنْ اَطَاعَنِىْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِىْ فَقَدْ اَبٰى

"আমার উম্মতের সকলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে কেবল ঐ সমস্ত লোক ছাড়া যারা অস্বীকার করেছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, অস্বীকারকারী কারা? তিনি বললেন, যারা আমার আনুগত্য ও অনুসরণ করেছে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যারা আমার অবাধ্যতা করেছে তারা অস্বীকারকারী। (বোখারী)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

مَثَلِىْ وَمَثَلُ مَابَعَثَنِى اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَتٰى قَوْمًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اِنِّىْ رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَىَّ وَاِنِّىْ اَنَا النَّذِيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَاَطَاعَهٗ طَائِفَةٌ مِّنْ قَوْمِهٖ فَاَدْلَجُوْا فَانْطَلَقُوْا عَلٰى مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ

فَاَصْبَحُوْا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَاَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ
اَطَاعَنِىْ وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهٖ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِىْ وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهٖ مِنَ الْحَقِّ

"আমার উদাহরণ এবং আল্লাহ তাআলা আমাকে যে শরীয়ত দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে স্বীয় জাতির নিকট এসে এই কথা বলে যে, "আমি শত্রুর বিরাট বাহিনী স্বচক্ষে দেখেছি, তোমাদের জন্য আমি বিবস্ত্র ভয়প্রদর্শনকারী (এটা জাহিলিয়াত যুগের প্রথানুযায়ী ভাষার বাগধারা) তোমরা জলদি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর।" এ কথা শুনে তাদের একদল লোক আনুগত্য করলো এবং রাতের অন্ধকারেই সুযোগ করে অন্যত্র চলে গিয়ে আত্মরক্ষা করলো। পক্ষান্তরে, অপর একদল তার কথাকে বিশ্বাস করলো না এবং নিজেদের এলাকাতেই রয়ে গেল। এদিকে সকাল বেলায়ই বিরাট শত্রুবাহিনী এসে তাদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে ধ্বংস করে দিল। বস্তুতঃ এটাই উদাহরণ ঐ ব্যক্তির যে আমার আনুগত্য করলো ; আমার শরীয়তের অনুসরণ করলো এবং ঐ ব্যক্তির যে আমার অবাধ্যতা করলো ; যে সত্য আমি নিয়ে এসেছি তার প্রতি মিথ্যারোপ করলো।" (বোখারী)

অপর এক হাদীসে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উদাহরণ এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

كَمَثَلِ مَنْ بَنٰى دَارًا وَّ جَعَلَ فِيْهَا مَاْدُبَةً وَّ بَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابَ
الدَّاعِىَ دَخَلَ الدَّارَ وَاَكَلَ مِنَ الْمَاْدُبَةِ وَمَنْ لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِىَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ
وَلَمْ يَاْكُلْ مِنَ الْمَاْدُبَةِ فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَ الدَّاعِىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَمَنْ اَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ وَمَنْ عَصٰى
مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَ مُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ

"আমার উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে কোন গৃহ নির্মাণ করলো এবং এতে উৎকৃষ্ট রকমের খাদ্য প্রস্তুত করলো। অতঃপর দাওয়াত দেওয়ার জন্য একজন আহ্বায়ক পাঠালো। যে ব্যক্তি এই আহ্বায়কের কথা মানলো সে এই গৃহে প্রবেশ করলো এবং খানা খেলো। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আহ্বায়কের কথা মানলো না সে গৃহে প্রবেশ করতে পারলো না এবং খানাও খেতে পারলো

না। এই উদাহরণের মধ্যে গৃহ হচ্ছে জান্নাত, আহ্বানকারী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অতএব, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ করলো সে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য ও অনুসরণ করলো। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যতা করলো সে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা করলো। বস্তুতঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের মধ্যে পার্থক্যকারী (অর্থাৎ তাঁর অনুগত ও অনুসারী লোকেরা মুমেন আর তাঁর অবাধ্য লোকেরা কাফের।) (শরহে শেফা, বুখারী)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা সাইয়্যিদুল মুরসালীন হাবীবে রাব্বুল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ ফরজ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

নবী করীম (সাঃ)-এর আনুগত্যের অর্থ কি?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এতায়াত ও আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে, যে কোন হুকুম ও বিধান তিনি বর্ণনা করেছেন সে সবকিছুকে মেনে নেওয়া ; এগুলোর উপর আনুগত্য প্রকাশ করে প্রতিটি কথা ও বিষয়ের উপর আমল করা। কেননা হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও বিষয়ের উপর আমল করা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের উপর আমল করারই নামান্তর। কারণ, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণের হুকুম খোদ কুরআনেই দেওয়া হয়েছে, যেমন পূর্বোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা গেছে। এছাড়া কুরআনে এ কথাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি যে কথা বা যে কাজেরই হুকুম করে থাকেন কিংবা কোন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকেন সব আল্লাহ তাআলার হুকুম মুতাবেকই হয়ে থাকে ; নিজের মনগড়া বা বানোয়াট কোন হুকুম তিনি করেন না।

যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى ۝

"তিনি মনগড়া কোন কথা বলেন না। বরং তা হয় খালেছ ওহী, যা তাঁর প্রতি প্রেরণ করা হয়।" (সূরা নাজম)

হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-কে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ

অর্থাৎ পবিত্র কুরআনই তো হচ্ছে তাঁর আখলাক।

হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কাজে নিষেধ করা, কারও প্রতি রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট হওয়া এ সবকিছু ছিল কুরআন পাকের বিধান অনুযায়ী। নিজের ব্যক্তিগত কোন স্বার্থে তিনি কারো থেকে প্রতিশোধ নিতেন না। হাঁ, আল্লাহ তাআলার হুকুমের বে–হুরমতি বা সীমা লংঘন যদি কেউ করতো, তাহলে তাঁর ক্রোধের সামনে কেউ টিকতে পারতো না।

মাওলানা মানাজের আহসান গিলানী (রহঃ) শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ)–এর এক মূল্যবান উক্তির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন ঃ পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ○

"আপনি মহান চরিত্রের উপর রয়েছেন।" (সূরা কলম)

অপরদিকে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে রয়েছে ঃ "তাঁর চরিত্র ছিল আল–কুরআন"।

উক্ত আয়াত ও হাদীসে বহুবচন শব্দ 'আখলাক' ব্যবহার না করে 'খুলুক' এক বচন ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে এ কথা বুঝানো যে, যাবতীয় সুন্দর চরিত্রের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর পুত–পবিত্র এক সত্তায়। এমনিভাবে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়—'আজীম' (মহান) বিশেষণটি কুরআনের জন্য খোদ কুরআনেই ব্যবহৃত হয়েছে। অনুরূপভাবে এ 'আজীম' বিশেষণটিই হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্রের জন্যও কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য দাঁড়ায় এ–ই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন 'কুরআন' এবং কুরআন হচ্ছে 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'। এ জন্যেই শায়খ ইবনে আরাবী (রহঃ)–এর ভাষ্য হচ্ছে, পবিত্র কুরআনকে দেখা আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার মধ্যে কোনই তফাৎ নাই। বস্তুতঃ কুরআনকে দৈহিক আকৃতি দেওয়া হয়েছে আর তার নাম হয়েছে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব।

শায়খ ইবনে আরাবী (রহঃ) আরও বলেন, কুরআন আল্লাহর কালাম। আর আল্লাহর কালাম হচ্ছে আল্লাহর সেফত বা গুণ–বিশেষণ। যার ফল এই দাঁড়ায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সেফত। এ

জন্যেই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "যে রাসূলের আনুগত্য করলো, সে নিঃসন্দেহে আল্লাহর আনুগত্য করলো।"

আরও বলা হয়েছে ঃ"তিনি নিজের মন থেকে গড়ে কিছু বলেন না।" (সূরা নাজ্‌ম)

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর হাবীবে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরাপুরি আনুগত্যের তওফীক দান করুন—আমীন।

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

তৃতীয় হক

হুযূর (সাঃ)-এর সুন্নত, আদত ও স্বভাব-চরিত্রের অনুসরণ

সাইয়্যেদুল মুরসালীন হাবীবে রাব্বুল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং তাঁর মুবারক আদত ও উন্নত স্বভাব-চরিত্রের অনুসরণ করাও উম্মতের উপর একান্ত জরুরী। যেমন—আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

“হে রাসূল ! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের সব গুনাহ মাফ করে দিবেন ; আর আল্লাহ তাআলা বড় ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।”

আয়াতের শানে নুযূল

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত, একদল লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আল্লাহ তাআলার প্রতি তাদের মহব্বত ও ভালবাসার দাবী করে বলল—

يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نُحِبُّ اللّٰهَ

“ইয়া রাসূলাল্লাহ ! নিঃসন্দেহে আমরা আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসী।”

তাদের এই দাবীর পরই আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন।

এরূপ একটি রেওয়ায়াতও বর্ণিত আছে যে, কা'ব ইবনে আশরাফ এবং তার সাথীদের সম্পর্কে এই পবিত্র আয়াত নাযিল হয়েছিল। তারা বলেছিল—

نَحْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَاَحِبَّاؤُهُ ط وَنَحْنُ اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ

“আমরা তো আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয় ও ভালবাসার পাত্র।”

অর্থাৎ পিতা-মাতার নিকট সন্তান যেমন প্রিয় ও আদরণীয় হয় এমনিভাবে আমরাও আল্লাহ তাআলার প্রিয় ও আদরণীয়। আর আমরাও আল্লাহ তাআলাকে খুব বেশী ভালবাসী।

তখন এই আয়াতে পাক নাযিল হয়েছে। এতে আল্লাহ তাআলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হুকুম করেছেন যে, হে আমার প্রিয় হাবীব ! আপনি এদেরকে বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার দাবী কর তাহলে আমার ইত্তেবা ও অনুসরণ কর। আর তখনি আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন।

এই পবিত্র আয়াতে আল্লাহর মহব্বতের দাবীদারকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণ করার হুকুম করা হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণকে আল্লাহর মহব্বতের আলামত ও নিদর্শন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং তাঁর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার জন্য রাসূলের ইত্তেবা ও অনুসরণকে শর্ত হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

খালেক ও মালেক আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত

এখানে এ কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, খালেক ও মালেক মহান আল্লাহকে মহব্বত করা এবং তাঁকে ভালবাসা একটি একান্ত স্বভাবগত ও অপরিহার্য বিষয়। বরং আল্লাহ তাআলাকে ভালবাসা ও তাঁর প্রতি আন্তরিক মহব্বত রাখা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য। বরং সৃষ্টিগতভাবেই অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য। মাখলুক বা সৃষ্টির উপর স্বীয় মুহসিন, তার প্রতিপালনকারী মহান রব্ব, স্বীয় খালেক ও মালেক মহান আল্লাহ তাআলার প্রতি নিরংকুশ মহব্বত ও ভালবাসা রাখা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। যার মধ্যে স্বীয় প্রতিপালনকারী রব্ব, তার সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা নাই, সে তার আদি অকৃত্রিম ও বিশুদ্ধ সৃষ্টিগত স্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নাই। তার মত এত বড় নিমকহারাম, কৃতঘ্ন, না-শোকর ও অকৃতজ্ঞ আর নাই। সে মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। বরং চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও লাখো গুণ বেশী জঘন্য।

কেননা, একটি কুকুরও তার অনুগ্রহকারীকে চিনে এবং তার কৃতজ্ঞতায় জীবন বিসর্জন দেয়। সুতরাং আল্লাহর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা রাখা মখলূকের উপর অপরিহার্য ও একান্ত জরুরী এবং আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও ভালবাসার জন্য তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণ করা লাযেম–তথা অবশ্য কর্তব্য। বস্তুতঃ পরিপূর্ণ ইত্তেবা ও অনুসরণ করার জন্য পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালবাসা থাকা জরুরী। কারণ, যখন পরিপূর্ণ মহব্বত হবে তখনি পরিপূর্ণ ইত্তেবা ও অনুসরণ করা সম্ভব হবে।

অতএব, উপরোক্ত আয়াত থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইটি হক জানা গেল। এক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণ করা জরুরী। দুই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা অপরিহার্য।

মহব্বতের সাথে আল্লাহর রাসুলের অনুসরণ

বস্তুতঃ ইত্তেবা ও অনুসরণ যখন মহব্বতের সাথে হবে তখন এই ইত্তেবার স্বাদ ও মজাই হবে ভিন্ন। আইনগতভাবে অনুসরণ করা আর মহব্বত ও ভালবাসার সাথে অনুসরণ করার মধ্যে আসমান–যমীনের তফাৎ ও ব্যবধান হয়ে থাকে। চাকর এবং কর্মচারীও তার মালিকের অনুসরণ করে। আর প্রেমিকও তার প্রেমাস্পদের অনুসরণ করে। কিন্তু এ দুইয়ের মাঝে কত বড় পার্থক্য বিদ্যমান!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে–ইত্তেবা ও অনুসরণ উদ্দেশ্য, তা হল মহব্বত ও ভালবাসার সাথে ইত্তেবা ও অনুসরণ। যেমন একজন আশেক বা প্রেমিক তার মাশুক বা প্রেমাস্পদের অনুসরণ করে এবং অনুসরণ করতে গিয়ে তার এক নৈসর্গিক আনন্দ–উচ্ছাস ও এক অবর্ণনীয় ও আশ্চর্য স্বাদ অনুভব করে। নিম্নোক্ত আয়াতে এই বিষয়টিই সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে—

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

"অতএব কছম আপনার রব্বের, এসব লোক পূর্ণ ঈমানদার হবে না, যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে যে–সব ঝগড়া–বিবাদ সংঘটিত হয়, সেগুলোর মীমাংসা আপনার দ্বারা করিয়ে নেয়, অতঃপর আপনার এই মীমাংসায় তারা নিজেদের অন্তরে কোনরূপ সংকীর্ণতা বোধ না করে এবং পুরাপুরি মেনে নেয়।" (সূরা নিসা)

রাসূল (সঃ)এর তিন হক

এই পবিত্র আয়াতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হকের প্রতিই ইশারা করা হয়েছে। বরং এই আয়াতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিনটি 'হক' বর্ণনা করা হয়েছে।

(১) নিজেদের পারস্পরিক যাবতীয় বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাকাম বা বিচারক ও মীমাংসাকারী স্বীকার করে নেওয়া। আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তো স্বয়ং তাঁর দ্বারা মীমাংসা করানো। আর আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লামের ওফাতের পর নিজেদের যাবতীয় বিষয় আঁ–হযরতের রেখে যাওয়া আহকাম ও বিধানের সম্মুখে পেশ করা। অতঃপর যা তাঁর রেখে যাওয়া বিধান ও সুন্নাতের মুতাবিক হবে, তা গ্রহণ করা।

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা ফায়সালা করে দিবেন (উপরে বর্ণিত দুই অবস্থায়) তা গ্রহণ করে নিতে মনের ভিতরে কোন প্রকার সংকোচ ও অসন্তুষ্টি না আসা। আর এটা তখনি হতে পারে যখন ফয়সালা ও মীমাংসাকারী এমন প্রিয় হবে যে আশেক তার প্রবৃত্তির সকল চাহিদা ও আকাংখা তার প্রিয়তমের রেযা ও সন্তুষ্টি লাভে বিসর্জন দিয়ে দেয়। যেমন জনৈক কবি বলেছেন—

خواهشیں قربان کردے سب رضائے دوست پر
پهر میں دیکھوں که دل کا چاها کیوں نه هو

"বন্ধুর সন্তুষ্টির জন্য সকল আকাংখা কুরবান করে দাও। তারপর আমি দেখব অন্তরের কামনা কেন পূর্ণ হবে না।"

সুতরাং কোন খোদাপ্রেমিক যখন তার প্রবৃত্তির সকল ইচ্ছা ও আকাংখা প্রেমাস্পদের রেযা ও সন্তুষ্টি অর্জনে বিসর্জন দিবে তখন প্রেমাস্পদের রেযা

ও সন্তুষ্টিই তার রেযা ও সন্তুষ্টি হয়ে যাবে। পরন্তু, প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে যে কোন হুকুম হবে এটাই তার সন্তুষ্টি হবে। এমতাবস্থায় প্রেমাস্পদের হুকুম মেনে নিতে ও তা গ্রহণ করে নিতে তার অন্তরে কোন প্রকার দ্বিধা সংকোচ ও অসন্তুষ্টি আসবে না। বরং প্রতিটি হুকুম কার্যকর করতে এক আশ্চর্য স্বাদ ও আনন্দ অনুভূত হবে। অতএব, এটা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের তৃতীয় হক হলো যে, স্বীয় প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা-বাসনা, ইচ্ছা ও আকাংখাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেযা ও সন্তুষ্টির মধ্যে বিলুপ্ত করে দিতে হবে। যেমন নিম্নোক্ত পবিত্র হাদীস দ্বারা বিষয়টি প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট হয়েছে—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ
هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ

“রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ তার ইচ্ছা ও আকাংখা আমার আনিত শরীয়ত ও আহকামের তাবে ও অনুগত না হবে।” (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৩০১)

এখানে উল্লেখিত ‘আমার আনিত শরীয়ত’ অংশে কুরআন ও হাদীস দুইটিই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং পরিপূর্ণ মুমিন তখনি হবে যখন স্বীয় ইচ্ছা ও আকাংখাকে কুরআন ও হাদীসের অনুগামী বানাবে। তখন তার অবস্থা হবে—

رشتہ در گردنم افگندہ دوست
میبرد ہر جا کہ خاطر خواہ اوست

“আমার গর্দানে রশির লাগাম ঢেলে আমার বন্ধু যেখানে তার মর্জি সেখানে নিয়ে যাচ্ছে।”

বস্তুতঃ খাঁটি আশেক ও প্রেমিকদের অবস্থা তো এই হয় যে, প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে যদি কোন কষ্টও পৌছে, এটাকেও সে পরম শান্তি মনে করে। যেমন বলা হয়েছে—

نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاك تیغت
سر دوستان سلامت کہ تو خنجر آزمائی

“হে প্রিয় ! তোমার তরবারীর আঘাতে শত্রুপক্ষ ধ্বংস হবে—এ সৌভাগ্য যেন তাদের নসীব না হয়। শান্তি ও সৌভাগ্য তো তোমার সেই আপন-জনদের যাদের শিরে তুমি তোমার তরবারীর আঘাত হেনে তা যাচাই করে নিয়েছ।”

এতদ্ব্যতীত ইত্তেবায়ে সুন্নতের মধ্যে কোন কষ্টও নাই। যদি নফসের কম হিম্মতী ও কোতাহীর কারণে কখনো কোন কষ্ট অনুভূত হতে থাকে তাহলে প্রেমাস্পদের আচরণের উপর উৎসর্গ হয়ে যাবে এবং তার হুকুম ও নির্দেশ মান্য করার মধ্যে স্বাদ উপলব্ধির মুরাকাবা করবে। ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক সর্বাবস্থায়ই যে সুন্নতের ইত্তেবা করা কর্তব্য, নফসকে সেদিকে নিবিষ্ট করবে। নফসকে বুঝাবে যে, দুনিয়াতে এই সামান্য কষ্ট সহ্য কর। আখেরাতে কেবল মজা আর মজাই হবে।

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمٰتِهٖ وَاتَّبِعُوْهُ
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

“সুতরাং আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁর এমন উম্মী নবীর প্রতি ঈমান আন যিনি স্বয়ং আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর আহকামের প্রতি ঈমান রাখেন এবং তাঁর নবীর অনুসরণ কর, যাতে তোমরা হেদায়াত পেতে পার।” (সূরা আরাফ)

এই পবিত্র আয়াতে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার হুকুমের সাথে সাথে তাঁর ইত্তেবা ও অনুসরণ করারও হুকুম দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে যে, যদি তাঁর অর্থাৎ আমার নবীর ইত্তেবা কর তাহলে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। ইত্তেবা ও অনুসরণের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায় রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ও যে পর্যায়ের অনুসরণকারী হবে তাকে ততটুকু হেদায়াতপ্রাপ্ত গণ্য করা হবে।

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي
التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ

"যারা এমন উম্মী রাসূল ও নবীর অনুসরণ করে যাকে তারা নিজেদের নিকট তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পেয়েছে তিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেন এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেন এবং পাক জিনিসকে তাদের জন্য হালাল বলেন এবং নিকৃষ্ট জিনিসকে তাদের উপর হারাম করেন।" (সূরা আরাফ)

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○

"তোমাদের জন্য অর্থাৎ এমন লোক যারা আল্লাহকে এবং কিয়ামত দিবসকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে এক উত্তম নমুনা ও আদর্শ বিদ্যমান রয়েছে।"

রাসূল (সঃ)এর আদর্শ-এর অর্থ কি

হাকীম মুহাম্মদ ইবনে আলী তিরমিযী (রহঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ)-এর মধ্যে উত্তম আদর্শ হল এই যে, শরীঅতের বিষয়াবলীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করা এবং তাঁর সুন্নাতের ইত্তেবা করা। কথায় ও কাজে রাসুল করীম (সাঃ)-এর সামগ্রিক পবিত্র জীবনের কোন অবস্থারই বিপরীত পথ ও পন্থা অবলম্বন না করা।

অধিকাংশ মুফাসসিরীনই এই অর্থ বর্ণনা করেছেন। আর যেহেতু 'আল্লাহর রাসূলের মধ্যে' বলা হয়েছে যদ্দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র সত্তা এবং তাঁর সামগ্রিক পবিত্র জীবনই অনুসরণ ও অনুকরণযোগ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল বরকতময় সুন্নাত, পবিত্র হালাত, কথা, বাণী ও কাজ মোটকথা, তাঁর সবকিছুই অনুসরণযোগ্য। আর প্রতিটি কাজ ও অবস্থায় তাঁর অনুসরণ করা তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালবাসা ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং এই আয়াত দ্বারাও রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত রাখা একান্ত জরুরী হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, মহব্বতের জন্য ইত্তেবা অপরিহার্য। জনৈক কবি কত সুন্দর বলেছেন—

تَعْصِى الرَّسُوْلَ وَاَنْتَ تَزْعَمُ حُبَّهٗ　　هٰذَا لَعَمْرِىْ فِى الْفِعَالِ بَدِيْعٌ

لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَاَطَعْتَهٗ　　اِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُّحِبُّ مُطِيْعٌ

"তুমি রাসূলের নাফরমানীও করছ আবার তাঁর মহব্বতেরও দাবী করছ। আমি শপথ করে বলছি তোমার এই পন্থা খুবই আশ্চর্যকর। অর্থাৎ এটা আকল ও বুদ্ধির পরিপন্থী এবং অকল্পনীয় তোমার মহব্বত যদি সত্য হত তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর (রাসূল সাঃ) অনুসরণ করতে। নিঃসন্দেহে প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের অনুগত হয়ে থাকে।"

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ

"(হে আল্লাহ!) আপনি আমাদের সহজ ও সরল পথ প্রদর্শন করুন। সেসব লোকের পথ যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত দান করেছেন ও অনুগ্রহ করেছেন।"

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী (রহঃ) একজন বিশিষ্ট সাধক ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এই পবিত্র আয়াতের তফসীরে বলেন—"সিরাতে মুস্তাকীম বা সহজ-সরল পথ অর্থাৎ আমাদেরকে সেসব লোকের পথের হেদায়াত দান করুন যাদের প্রতি আপনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত ও তরীকার ইত্তেবা সহ অনুগ্রহ করেছেন।"

এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা করার হুকুম দিয়েছেন এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণের উপর হেদায়াতের ওয়াদা করেছেন। যেমন পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ○

"এবং তাঁর (রাসূলের) ইত্তেবা কর, যাতে তোমরা হেদায়াত পেতে পার।"

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا ؕ

"যদি তোমরা রাসূলের আনুগত্য কর, তাহলে হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।"
(সূরা নূর)

কেননা, আল্লাহ তাআলা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে মখলূকের হেদায়াতের জন্যই প্রেরণ করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত আয়াত পাকে ইরশাদ হয়েছে—

وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"আর এতে কোন সন্দেহ নাই যে, আপনি সিরাতে মুস্তাকীম অর্থাৎ একটি সহজ ও সরল পথের হেদায়াত দিচ্ছেন।" (সূরা শূরা)

রাসূল (সঃ)-এর অনুসরণে আল্লাহর মহব্বত ও মাগফিরাতের ওয়াদা

এছাড়া মহান আল্লাহ তাআলা রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণ করার উপর স্বীয় মহব্বত ও মাগফিরাতের ওয়াদা করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"হে রাসূল ! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বত রাখ, তবে তোমরা আমার ইত্তেবা কর। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মহব্বত করবেন, তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা অতিশয় ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"

এরূপ আরো বহু আয়াতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে উপরে মাত্র দশটি আয়াত শরীফ উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর এ পর্যায়ে এই বিষয়বস্তুর কয়েকখানি হাদীস পেশ করা হল।

عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِهٖ

"হযরত মালেক ইবনে আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি জিনিস রেখে গেলাম। যতক্ষণ তোমরা এই দুইটি জিনিস আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হল আল্লাহর কিতাব পবিত্র কুরআন। আর অপরটি হল আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নত।" (মিশকাত শরীফ)

এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহর কিতাব কুরআনে পাক এবং রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর দৃঢ়ভাবে আমল করাই পথভ্রষ্টতা থেকে হিফাযতের একমাত্র পথ।

হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাযিঃ) রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন—

اَنَّهٗ قَالَ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ

"রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার সুন্নত এবং আমার চূড়ান্ত হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নতকে দাঁতে কামড়ে (মজবুতীর সাথে) আঁকড়ে ধরে রাখ এবং বিদআত থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও। কেননা, যে কোন বে-সনদ ও সূত্রহীন কথাই বিদআত। আর প্রত্যেক বিদআতই গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা। হযরত জাবের (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতে এ কথাও অতিরিক্ত আছে যে, "আর প্রত্যেক গোমরাহীই জাহান্নামে যাবে।"

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে—

صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيْهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ قَوْمٍ يَتَنَزَّهُوْنَ عَنِ الشَّىْءِ اَصْنَعُهٗ فَوَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَعْلَمُهُمْ بِاللّٰهِ وَاَشَدُّهُمْ لَهٗ خَشْيَةً

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজ করেছেন এবং রুখসতের উপর আমল করেছেন। অতঃপর কিছু লোক এই আমল হতে পরহেয

করে। এই সংবাদ আঁ–হযরত (সাঃ)–এর নিকট পৌছলে তিনি আল্লাহ তাআলার হামদ ও ছানা বর্ণনা করার পর ইরশাদ করলেন, সেই লোকদের কি হল যে, তারা এমন আমল থেকেও পরহেয করে এবং বেঁচে থাকতে চায়, যা আমি নিজে করি। আল্লাহর কছম, আমি তাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক চিনি ও জানি এবং তাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক ভয় করি।"

(মিশকাত, পৃঃ ২৭ ; বুখারী, পৃঃ ১০৮১)

এটা এই জন্য যে, যার যে পরিমাণ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলীর পরিচয় লাভ হবে, তার সেই পরিমাণ আল্লাহ তাআলার শাস্তি ও ধর–পাকড়ের ভয়–ভীতি থাকবে।

এক হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে—

وَاُمِرَتْ اُمَّتِىْ اَنْ يَّاْخُذُوْا بِقَوْلِىْ وَيُطِيْعُوْا اَمْرِىْ وَيَتَّبِعُوْا سُنَّتِىْ فَمَنْ رَضِىَ بِقَوْلِىْ رَضِىَ بِالْقُرْاٰنِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ـ

"আমার উম্মতকে হুকুম দেওয়া হয়েছে, তারা যেন আমার কথার অনুসরণ করে এবং আমার নির্দেশের আনুগত্য করে ; আমার সুন্নতের ইত্তেবা করে। অতএব, যে ব্যক্তি আমার কথার উপর রাযী হয়ে গেল, সে কুরআনের উপর রাযী হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে যা হুকুম করেন তোমরা তা গ্রহণ কর ; সে অনুযায়ী আমল কর এবং যেসব বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, সেসব থেকে বিরত থাক।" (শরহে শিফা—কাযী ইয়ায (রহঃ))

মুসান্নাফ আবদুর রায্যাক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنِ اسْتَنَّ بِسُنَّتِىْ فَهُوَ مِنِّىْ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ

"যে ব্যক্তি আমার সুন্নতের অনুসরণ করল অতঃপর সে অনুযায়ী আমল করল, সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত। আর যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সে আমার দলভুক্ত নয়।" অর্থাৎ আমার ও আমার অনুসারীদের সাথে তার কোনই সম্পর্ক নাই। (শিফা—কাযী ইয়ায (রহঃ))

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اَنَّهٗ قَالَ اِنَّ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ـ

নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা ও বাণী হল, আল্লাহর কিতাব (কুরআন পাক)। আর সর্বোত্তম তরীকা হল, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) তরীকা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট বিষয় হল, বে–সনদ মনগড়া বিদআত। আর প্রত্যেক মনগড়া বিদআতই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ২৭)

একথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরীকাই সর্বোত্তম তরীকা, সুতরাং তাঁর ইত্তেবা করাও একান্ত জরুরী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

اَلْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ اٰيَةٌ مُّحْكَمَةٌ اَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ اَوْ فَرِيْضَةٌ عَادِلَةٌ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ ـ

তিনটি বিষয়ের 'ইলম'ই প্রকৃত ইলম। ১. আয়াতে মুহকামা ২. সুন্নতে কায়েমা ও ৩. ফরীযায়ে আদেলা'র ইলম। এতদ্ব্যতীত আর যে সব ইলম রয়েছে, সেগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত। (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৩৫)

আয়াতে মুহকামা ঃ হাদীসে উক্ত আয়াতে মুহকামার দ্বারা কুরআনের আয়াত উদ্দেশ্য। মুহকামা শব্দের অর্থ মযবুত ও সুদৃঢ়। কুরআন শরীফের আয়াতসমূহ অত্যন্ত মযবুত ও সুদৃঢ়। কেননা, কুরআনের শব্দাবলী ও এর অর্থের মধ্যে সামান্যতমও বক্রতা নাই।

সুন্নতে কায়েমা ঃ সুন্নতে কায়েমার দ্বারা আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক অবস্থা আমল, কথা ও বাণী উদ্দেশ্য। কায়েমা শব্দের অর্থ প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। সুন্নতের সংগে এই শব্দটি জুড়ে দেওয়ার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যে কেউ কোন বিষয়কে সুন্নত বলে দিলেই সেটাকে সুন্নত বলা ঠিক হবে না। বরং যে কথা ও কাজ আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত রয়েছে, সেটাকেই সুন্নত মনে করতে হবে।

ফরীযায়ে আদেলা ঃ এর দ্বারা শরয়ী ও দ্বীনী ফরযসমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ফরীযায়ে আদেলাকে সুন্নতে কায়েমা ও আয়াতে মুহকামার পর পৃথকভাবে উল্লেখ করার দ্বারা ইলমে ফেকাহ ও উসূলে ফেকাহ অর্থাৎ ফিকাহ শাস্ত্র ও ফিকাহ শাস্ত্রের মৌলনীতির জ্ঞান হাসিল করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়।

সুন্নতের অনুসারী জান্নাতে প্রবেশ করবে

এক হাদীস শরীফে এসেছে—

وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُدْخِلُ الْعَبْدَ الْجَنَّةَ بِالسُّنَّةِ تَمَسَّكَ بِهَا ـ

"হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ; সুন্নতকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরে সে অনুযায়ী আমল করার কারণে।" (শিফা— কাযী ইয়ায (রহঃ))

ফিৎনা-ফাসাদের যুগে সুন্নতের অনুসরণের সওয়াব

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত—

قَالَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فَلَهٗ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের ফেৎনা-ফাসাদের যমানায় যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে মযবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে (এবং সে অনুযায়ী আমল করবে), তার জন্য একশত শহীদের সওয়াব রয়েছে।" অর্থাৎ সে একশত শহীদের সওয়াব পাবে।

(মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৩০)

হাদীসে উল্লেখিত 'ফাসাদ' শব্দের ব্যাপকতায় ইতেকাদ বা বিশ্বাসগত ফাসাদ এবং আমল ও কর্মের ফাসাদ সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুন্নত পরিত্যাগ করে নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা ও মতের অনুসরণ করা সবচেয়ে বড়

ফাসাদ। তাই এরূপ অবস্থার মুকাবিলায় এমন ফেৎনাসংকুল যমানায় আকীদা ও আমলের ক্ষেত্রে হুযূর (সাঃ)-এর সুন্নতের উপর অটল ও সুদৃঢ় থাকা একশত শহীদের সওয়াব লাভের উসীলা হয়।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ افْتَرَقُوْا عَلٰى اِثْنَتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِلَّةً وَاِنَّ اُمَّتِىْ تَفْتَرِقُ عَلٰى ثَلَاثٍ وَّ سَبْعِيْنَ كُلُّهَا فِى النَّارِ اِلَّا وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِىْ مَا اَنَا عَلَيْهِ وَاَصْحَابِىْ ـ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিঃসন্দেহে বনী ইসরাঈল বাহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল আর আমার উম্মত তিহাত্তর ফের্কায় বিভক্ত হবে। এর মধ্যে একটি ফের্কা ব্যতীত বাকী সব ফের্কা ও দল জাহান্নামী হবে। সাহাবীগণ আরয করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত সেই ফের্কা বা দল কোন্‌টি? হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করলেন, সেই দলটি হল, যারা আমার এবং আমার সাহাবীদের তরীকার উপর থাকবে।" অর্থাৎ যারা আমার ও আমার সাহাবীদের তরীকা অবলম্বন করবে তারা নাজাত পাবে। আর বাকী সব দল জাহান্নামে যাবে। (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৩০)

তিরমিযী ও ইবনে মাজা কিতাবে রেওয়ায়াত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বিলাল ইবনে হারেস (রাযিঃ)কে বলেছিলেন—

مَنْ اَحْيٰى سُنَّةً مِنْ سُنَّتِىْ قَدْ اُمِيْتَتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلَ اُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا ـ

"যে ব্যক্তি আমার পর আমার কোন মৃত সুন্নতকে জীবিত করবে, সে ব্যক্তি ঐ সকল লোকের বরাবর সওয়াব লাভ করবে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত এই সুন্নতের উপর আমল করবে। তবে তাদের সওয়াবের মধ্যে কোন কমতি হবে না। আর যে ব্যক্তি কোন গোমরাহী ও বিদআতের প্রচলন ঘটাবে, যা

আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) পছন্দ করেন না, সে ব্যক্তি ঐ সকল লোকের বরাবর গুনাহের অধিকারী হবে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত এই বিদআতের উপর আমল করবে। এতে আমলকারীদের গুনাহের মধ্যে কোন কমতি হবে না।" (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৩৩)

অপর এক হাদীসে এই বাক্যগুলোও বর্ণিত হয়েছে—

مَنْ اَحْيٰى سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ

"যে ব্যক্তি আমার কোন সুন্নত যিন্দা করল, সে আমাকে মহব্বত করল। আর যে আমাকে মহব্বত করল, সে জান্নাতে আমার সংগে থাকবে।" (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৩০)

হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে এই হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে—

قَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْيٰى سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحْيَانِىْ وَمَنْ اَحْيَانِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الْجَنَّةِ ـ

"হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি আমার সুন্নত যিন্দা করল, সে আমাকে যিন্দা করল। আর যে আমাকে যিন্দা করল, সে জান্নাতে আমার সংগে থাকবে।" (শিফা—কাযী ইআয (রহঃ)

সুন্নত যিন্দা করার অর্থ

সুন্নত যিন্দা করার অর্থ সুন্নতের উপর আমল করা, অন্যদের নিকট তা পৌছান এবং ব্যাপকভাবে এর প্রচার ও প্রসার ঘটান। আর 'আমাকে যিন্দা করল' এ কথার অর্থ হল এই যে, সে আমার যিকির ও আলোচনা বুলন্দ করল এবং হুকুম ও তরীকা উদ্ভাসিত করল।

মনের কামনা-বাসনা রাসূল (সঃ)-এর অধীন না করলে মুমিন হতে পারবে না

এক হাসীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনিত শরীঅতের তাবে ও অনুগত হবে।" (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৩০)

হযরত উমর (রাযিঃ) কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীসে তাওরাতের একটি নুসখা এনে পাঠ করার কথা উল্লেখ আছে, তাতে তিনি বলেন—

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَاَ لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَ اَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لَاتَّبَعَنِىْ ـ

"রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই মহান সত্তার কছম! যাঁর কুদরতের হাতে মুহাম্মদ (সাঃ)–এর জীবন। যদি মূসা (আঃ)ও এখন তোমাদের সম্মুখে জীবিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর ইত্তেবা কর তাহলেও তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহ হয়ে যাবে। যদি মূসা (আঃ) জীবিত থাকতেন এবং আমার নুবুওয়াতের যমানা পেতেন তাহলে তিনিও আমার ইত্তেবা ও অনুসরণ করতেন।" (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৩২)

উপরোল্লেখিত হাদীসসমূহের দ্বারা সাইয়্যেদুল মুরসালীন হাবীবে রাব্বুল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণ করা একান্ত জরুরী ও ফরয হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকেই তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ ইত্তেবা করার তাওফীক দান করুন।

সলফে সালেহীনদের ইত্তেবায়ে সুন্নত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)–এর নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল—

فَقَالَ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّا نَجِدُ صَلٰوةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِى الْقُرْاٰنِ وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَا اِبْنَ اَخِىْ اِنَّ

اللّٰهَ بَعَثَ اِلَيْنَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا وَاِنَّمَا نَفْعَلُ
كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ ـ

"হে আবূ আবদুর রহমান! নিঃসন্দেহে সালাতুল খওফ (ভয়কালীন নামায) এবং সালাতুল হাযর (মুকীম অবস্থাকালীন নামায)–এর আলোচনা আমরা কুরআনে পাই কিন্তু; সফরের নামাযের কোন আলোচনা তো কুরআনে পাই না? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) জওয়াব দিলেন, ভাতিজা! নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের নিকট এমন এক অবস্থায় নবী করে পাঠিয়েছেন যে, তখন আমরা কিছুই জানতাম না। সুতরাং আমরা তো তেমনি আমল করতে থাকব যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)কে করতে দেখেছি।" (নাসায়ী শরীফ, খণ্ড ১, পৃঃ ২১১)

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা সফর অবস্থায় নামায কসর পড়তে দেখেছি, সুতরাং সফরের সময় আমরা নামায কসরই পড়ব। পবিত্র কুরআনকে আমাদের চেয়ে তিনিই বেশী জানতেন, তাঁর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে। অতএব, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সফরের অবস্থায় কসর পড়তে হুকুম দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন—

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهٗ ـ

"কসরের নামায আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি একটা দান। সুতরাং আল্লাহ তাআলার দানকে তোমরা কবূল কর।"

(মিশকাত শরীফ, পৃঃ ১১৮)

এই পবিত্র হাদীসে 'তোমরা কবূল কর' একটা নির্দেশ বাক্য। আর কোন বিষয় ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রেই নির্দেশ দেওয়া হয়। অতএব সফররত অবস্থায় নামাযে কসর করা ওয়াজিব। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)–এর অভিমত এটাই। সারকথা হল এই যে, রাসূল মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শরীঅতের আহকাম ও বিধি–বিধানকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাই যে কোন ব্যক্তি এই দুইটির যে কোন একটিকে ছেড়ে দেবে সেই গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে—

سَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ وُلَاةُ الْاَمْرِ بَعْدَهٗ سُنَنًا اَلْاَخْذُ بِهَا
تَصْدِيْقٌ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتِعْمَالٌ لِطَاعَةِ اللّٰهِ وَقُوَّةٌ عَلٰى دِيْنِ اللّٰهِ لَيْسَ لِاَحَدٍ
تَغْيِيْرُهَا وَلَا تَبْدِيْلُهَا وَلَا النَّظْرُ فِيْ رَأْيِ مَنْ خَالَفَهَا مَنِ اقْتَدٰى بِهَا مُهْتَدِيْ
وَمَنِ اسْتَنْصَرَبِهَا مَنْصُوْرٌ وَمَنْ خَالَفَهَا وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَّاهُ اللّٰهُ
تَعَالٰى مَاتَوَلّٰى وَاَصْلَاهُ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি তরীকা জারী করেছেন। অর্থাৎ একটি দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালা নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন। সুতরাং এই সবগুলো গ্রহণ করা এবং এগুলোর উপর আমল করার অর্থই কিতাবুল্লাহকে সত্যরূপে কবূল করা। আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা এবং আল্লাহর দ্বীনকে শক্তিশালী করা। কোন প্রকার কম–বেশী করার মাধ্যমে এগুলোতে কোন ধরনের পরিবর্তন–পরিবর্ধন করার কারো কোন অধিকার নাই। আর যে কোন ব্যক্তি শরীয়তের দলীল–প্রমাণাদি (ইজমা ও কিয়াস) ব্যতীত শুধুমাত্র নিজের রায় ও মতের দ্বারা তাদের প্রদর্শিত পথ ও মতের বিরোধিতা করবে তার রায় ও চিন্তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করাও জায়েয নয়। যে ব্যক্তি তাদের প্রদর্শিত পথ–মত ও তরীকার আনুগত্য করবে সেই হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। যে ব্যক্তি তাদের প্রদর্শিত তরীকায় সাহায্য প্রার্থনা করবে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য করা হবে। পক্ষান্তরে যারা মুমিনদের (অর্থাৎ যারা সুন্নতে রাসূল (সাঃ) ও সুন্নতে খোলাফায়ে রাশেদীনের উপর দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ) তরীকা ব্যতীত অন্য কোন তরীকার ইত্তেবা করবে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সেই ভ্রান্ত তরীকার সাথেই যুক্ত করে রাখবেন যে তরীকায় তারা লেগে আছে এবং আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। জাহান্নাম কতই না মন্দ আবাস।"

রাসূল (সঃ)-এর সুন্নতের উপর আমল করা আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাসের নামান্তর

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ "রাসূল (সঃ) তোমাদেরকে যে বিষয়ের হুকুম করেন, তোমরা সে অনুযায়ী আমল কর আর তিনি যে বিষয় থেকে

তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা থেকে তোমরা বিরত থাক।" (সূরা হাশর)

এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর কিতাবকে সত্য বলে বিশ্বাস করার নামান্তর। অর্থাৎ কুরআনের প্রতি যে ব্যক্তির ঈমান থাকবে, সে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করবে।

খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের উপর আমল আল্লাহর আনুগত্য ও কুরআনের উপর আমলেরই নামান্তর

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ "যে ব্যক্তি রাসূলের (সঃ) ইতায়াত করলো, সে আল্লাহর ইতায়াত করলো।" অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)–এর ইরশাদ রয়েছে ঃ "তোমরা আমার আদর্শ এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে আঁকড়ে ধর।" এতে জানা গেল যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আনুগত্য করা এবং তাদের আদর্শের উপর আমল করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাআলারই আনুগত্য এবং পবিত্র কুরআনের উপর আমলেরই নামান্তর।

আল্লামা ইবনে শিহাব (রহঃ) বলেন—

بَلَغَنَا عَنْ رِجَالٍ مِنْ اَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا اَلْاِعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ نَجَاةٌ

"আমাদের নিকট আহলে ইলমদের (অর্থাৎ হযরত সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনদের) নিকট থেকে একথা পৌঁছেছে যে, তাঁরা বলেছেন, সুন্নতকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করার মধ্যেই মুক্তি নিহিত রয়েছে।"

সুন্নতের জ্ঞান লাভ করা জরুরী

হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) তাঁর গভর্নরদের উদ্দেশে এক পত্রে লিখেছিলেন যে, তোমরা সুন্নত অর্থাৎ হাদীসের জ্ঞান অর্জন কর। ফারায়েয ও ভাষা শিক্ষা কর। তখন তিনি একথাও লিখেছিলেন—

اِنَّ اُنَاسًا يُجَادِلُوْنَكُمْ يَعْنِىْ بِالْقُرْاٰنِ فَخُذُوْهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنَّ اَصْحَابَ السُّنَنِ اَعْلَمُ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

"অবশ্যই কিছু লোক তোমাদের সাথে কুরআন নিয়ে ঝগড়া করবে। (অর্থাৎ তারা কুরআন পাকের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে নিজেদের বক্র চিন্তাধারার সপক্ষে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করবে) তখন সুন্নতের মাধ্যমে তোমরা তাদের ঠেকাবে। কেননা সুন্নত ও হাদীস সম্পর্কে অভিহিত অভিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণই আল্লাহর কিতাব কুরআন পাক সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী হয়ে থাকেন।"

এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সুন্নাহ সম্পর্কে যিনি যত বেশী পারদর্শী হবেন কিতাবুল্লাহ সম্পর্কেও তিনি তত বেশী জ্ঞানী ও পারদর্শী হবেন। কেননা আঁ–হাদীস ও সুন্নার মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের তাফসীর করা হয়েছে। হাদীস ও সুন্নার মাধ্যমেই কুরআনের মর্ম ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা হয়েছে।

হযরত উমর (রাযিঃ)–এর ঘটনা

হযরত উমর (রাযিঃ)এর আরো একটি ঘটনা। একবার হজ্জের সময় তিনি যুলহুলাইফা নামক স্থানে ইহরাম বেঁধে দুই রাকাআত নামায আদায় করেন এবং তালবিয়া পাঠ করার পর বলেন—

اَصْنَعُ كَمَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেমন করতে দেখেছি আমিও তেমনি করছি।"

হযরত আলী (রাযিঃ)–এর উক্তি

হযরত আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন—

اِنِّىْ لَسْتُ بِنَبِىٍّ وَلَا يُوْحٰى اِلَىَّ وَلٰكِنِّىْ اَعْمَلُ بِكِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَسُنَّةِ نَبِيِّهٖ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى النُّسْخَةِ مَا اسْتَطَعْتُ ـ

"নিঃসন্দেহে আমি কোন নবীও নই আর আমার নিকট কোন ওহীও আসে না। তবে আমি আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করি। অন্য এক নুসখার বর্ণনানুযায়ী তিনি বলেছিলেন, আমি আমার শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী আমল করি।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে—

اِقْتِصَادٌ فِىْ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ اِجْتِهَادٍ فِىْ بِدْعَةٍ ـ جمع الفوائد

"সুন্নত মুতাবিক মধ্যম পর্যায়ের আমল করা বিদআতে লিপ্ত হয়ে কঠিন সাধনা করার চেয়েও বহু উত্তম।"

কেননা, সুন্নত মুতাবিক আমল করার দ্বারা সওয়াব পাওয়া যায়। আর বিদআতে লিপ্ত হওয়ার কারণে কঠিন শাস্তি হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর উক্তি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন—

صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ

"সফরের নামায দুই রাকআত। যে ব্যক্তি এই সুন্নতকে ছেড়ে দিল সে একটি নিয়ামত অস্বীকার করল।"

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ)-এর উক্তি

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বলেন—

عَلَيْكُمْ بِالسَّبِيْلِ وَالسُّنَّةِ فَاِنَّهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ عَبْدٍ عَلَى السَّبِيْلِ وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ اللّٰهَ فِىْ نَفْسِهٖ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ اَبَدًا وَمَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ عَبْدٍ عَلَى السَّبِيْلِ وَالسُّنَّةِ ذَكَرَ اللّٰهَ فِىْ نَفْسِهٖ فَاقْشَعَرَّ جِلْدُهٗ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ اِلَّا كَانَ مِثْلُهٗ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ قَدْ يَبِسَ وَرَقُهَا فَهِىَ كَذٰلِكَ اِذَا اَصَابَتْهَا رِيْحٌ شَدِيْدَةٌ فَتَحَاتَّ عَنْهَا وَرَقُهَا اِلَّا حَطَّ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتَّ عَنِ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا فَاِنَّ اِقْتِصَادًا فِىْ سَبِيْلِ سُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ اِجْتِهَادٍ فِىْ خِلَافِ سَبِيْلٍ وَّسُنَّةٍ وَّمُوَافَقَةِ بِدْعَةٍ وَانْظُرُوْا اَنْ يَّكُوْنَ عَمَلُكُمْ اِنِ اجْتِهَادًا اَوِ اقْتِصَادًا اَنْ يَّكُوْنَ عَلٰى مِنْهَاجِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَسُنَّتِهِمْ ـ

"তোমরা হক পথ ও সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। কেননা, কখনো এমন হবে না যে, কোন বান্দা হক পথ ও সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তার চোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়বে আর আল্লাহ তাআলা তাকে শাস্তি দিবেন। যে বান্দাহ হক পথ ও সুন্নতের উপর কায়েম থাকবে, আল্লাহর অধিক যিকির করবে এবং আল্লাহর ভয়ে তার শরীরের পশম খাড়া হয়ে যাবে তার দৃষ্টান্ত হল সেই বৃক্ষের ন্যায়, যার পাতা শুকিয়ে গেছে আর প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হয়ে সেগুলো উড়িয়ে নিয়ে গেল। এই ব্যক্তির গুনাহ এমনিভাবে ঝরে পড়ে যায় যেমনিভাবে বৃক্ষের পাতা ঝরে পড়ে। সুতরাং হক পথে সুন্নত মুতাবিক মধ্যম পর্যায়ের আমল করা হক পথ ও সুন্নতের পরিপন্থী বিদআতে লিপ্ত হয়ে কঠিন রিয়াযত-মুজাহাদা করার চেয়ে বহু উত্তম। (কেননা, বিদআতের সামান্য সংমিশ্রনও আমলকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।) আর খুব সাবধান থেকো! তোমাদের আমল কঠিন মুজাহাদার সাথে বেশীই হোক আর মধ্যম পর্যায়েরই হোক, সর্বাবস্থায়ই যেন তা আম্বিয়া-কেরামদের তরীকা ও সুন্নত মুতাবিক হয়।"

হযরত উমর ইবনে আযীয (রহঃ) কর্তৃক এক গভর্ণরের পত্রের জওয়াব

হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর খেলাফত কালে একটি শহরে চুরি ও লুটপাটের সংখ্যা খুব বেশী বেড়ে গিয়েছিল। তখন সেই এলাকার গভর্নর এক পত্রে খলীফাকে শহরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, এমতাবস্থায় অপরাধীদেরকে কিভাবে ধরা হবে—শুধু সন্দেহ আলামত দেখেই লোকদেরকে গ্রেফতার করা হবে, না শরীয়তের বিধান মুতাবিক সাক্ষী-সাবুদের পর গ্রেফতার করা হবে?

পত্রের জওয়াবে হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) লিখেন—

خُذُوْهُمْ بِالْبَيِّنَةِ وَمَا جَرَتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ فَاِنْ لَّمْ يُصْلِحْهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَلَا اَصْلَحَهُمُ اللّٰهُ ـ

"শরীয়ত ও সুন্নতের বিধান অনুযায়ী সাক্ষী-সাবুদের পরই গ্রেফতার করবে। এতে যদি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সংশোধন না করেন। তাহলে বুঝতে হবে তাদের সংশোধন করা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়।"

একখানি আয়াতের ব্যাখ্যা

হযরত আতা (রহঃ) "কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে

মীমাংসার জন্য তা আল্লাহ ও রাসূলের সোপর্দ কর” আয়াতের তাফসীর প্রসংগে বলেছেন—আল্লাহ ও রাসূলের সোপর্দ করার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের (সঃ) সুন্নতের সোপর্দ করা। অর্থাৎ তোমাদের পরস্পর ঝগড়া-বিবাদের বিষয়সমূহের নিষ্পত্তি কুরআন ও সুন্নাহর বিধানের মাধ্যমে করে নাও।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর উক্তি

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন ঃ

لَيْسَ فِىْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا اِتِّبَاعُهَا

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত তো ইত্তেবা ও অনুসরণ করার জন্যেই এসেছে।”

হযরত উমরের হজরে আসওয়াদকে সম্বোধন

হযরত উমর (রাযিঃ) হজরে আসওয়াদকে চুমু দেওয়ার সময় বলেছিলেন—

اِنَّكَ وَاللّٰهِ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْلَا اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ۔

“আল্লাহর কছম! নিঃসন্দেহে তুই একটি পাথর ছাড়া আর কিছু না। তোর না কারো কোন উপকার করার ক্ষমতা আছে, না তুই কারো কোন ক্ষতি করতে পারিস। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোকে চুমু দিতে না দেখতাম তাহলে কখনো তোকে চুমু দিতাম না।”

(মিশকাত শরীফ, পৃঃ ২২৪)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের সওয়ারী ঘুরানো

একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)কে এক জায়গায় তাঁর সওয়ারী ঘোরাতে (চক্কর কাটাতে) দেখা গেল। তাঁকে এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন—

لَآ اَدْرِىْ اِلَّآ اَنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهٗ فَفَعَلْتُهٗ

“আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি তাই আমিও এরূপ করছি। এছাড়া আমি আর কিছুই জানিনা।”

বে-দরকারী বিষয়েও সাহাবায়ে কেরামের এত্তেবায়ে সুন্নত

এতে বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) জরুরী নয় এমন বিষয়েও হুযূর আকরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা করতেন। হযরত মুজাহিদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন—

كُنَّا مَعَ اِبْنِ عُمَرَ فِىْ سَفَرٍ فَمَرَّ بِمَكَانٍ فَحَادَ عَنْهُ فَسُئِلَ عَنْهُ لِمَ فَعَلْتَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰذَا فَفَعَلْتُهٗ

“আমরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। এক জায়গা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, হঠাৎ তিনি একদিকে মুখ ফিরে দূরে সরে গেলেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এখানে পৌছে এমন করতে দেখেছি। এজন্যে (তাঁর অনুসরণে) আমিও তেমনি করলাম।” (জমউল-ফাওয়ায়েদ)

হযরত মুজাহিদ (রহঃ) থেকে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে ঃ

اَنَّهٗ كَانَ يَأْتِىْ شَجَرَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَيَقِيْلُ تَحْتَهَا وَيُخْبِرُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ۔

“হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে এক বৃক্ষের নিচে তশরীফ নিয়ে যেতেন এবং সেখানে তিনি কায়লূলাহ (দুপুরে আরাম) করতেন। তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন। (জমউল-ফাওয়ায়েদ)

আবূ উসমান হীরী (রহঃ) বলেছেন ঃ

مَنْ اَمَّرَ السُّنَّةَ عَلٰى نَفْسِهٖ قَوْلًا وَفِعْلًا نَطَقَ بِالْحِكْمَةِ وَمَنْ اَمَّرَ الْهَوٰى عَلٰى نَفْسِهٖ نَطَقَ بِالْبِدْعَةِ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ وَاِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا

“যে ব্যক্তি সুন্নতকে নিজের প্রবৃত্তির উপর কথা ও কাজে নিয়ন্ত্রক হিসাবে গ্রহণ করে নিতে পারবে, সে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে কথা বলবে। পক্ষান্তরে,

যে ব্যক্তি যথেচ্ছাচারিতাকে নিজের জন্য নির্দেশক বানিয়ে নিবে সে বেদআত ও দ্বীন-বহির্ভূত কথা বলবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, তোমরা তাঁর (মুহাম্মদের) অনুসরণ করলে হেদায়াত তথা সঠিক পথপ্রাপ্ত হবে।”

হযরত সাহল তসতরী (রহঃ) বলেছেন—

أُصُوْلُ مَذْهَبِنَا ثَلَاثَةٌ اَلْاِقْتِدَاءُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاَخْلَاقِ وَالْاَفْعَالِ وَالْاَكْلُ مِنَ الْحَلَالِ وَ اِخْلَاصُ السُّنَّةِ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔

“আমাদের সূফীয়ায়ে কেরাম (আধ্যাত্মিক সাধক দল)-এর তিনটি মৌলনীতি রয়েছে। এক, আখলাক-চরিত্রে এবং কাজে-কর্মে যাহেরী ও বাতেনীভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ ও অনুকরণ করা। দুই, পানাহার হালাল হওয়া। তিন, সকল অবস্থায় নিয়তকে খালেস করা। উত্তম কথা বা বাক্য আল্লাহ তাআলার নিকট পৌঁছে এবং নেক কাজ এটাকে আল্লাহর নিকট পৌঁছায়।”

উপরোক্ত উক্তির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, নেক কাজের দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যাবতীয় কথা-কথন, কাজ-কর্ম ও সামগ্রিক অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইত্তেবা ও অনুসরণ করা।

ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর ঘটনা

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) তাঁর নিজের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, একদিন আমি একটি জামাআতের সংগে এক জায়গায় ছিলাম। জামাআতের লোকেরা তাদের পরিধেয় কাপড় খুলে (গোসল করার জন্য) পানিতে নামে। তখন আমি একটি হাদীসের ব্যাপক অর্থের উপর আমল করলাম এবং কাপড় খোলা থেকে বিরত রইলাম।

হাদীসটি হল—

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ ۔

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন লুঙ্গী ব্যতীত গোসলখানায় প্রবেশ না করে।”

সেদিন রাতেই আমি স্বপ্নে দেখলাম জনৈক ব্যক্তি বলছেন—

يَا اَحْمَدُ اَبْشِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ بِاسْتِعْمَالِكَ السُّنَّةَ وَجَعَلَكَ اِمَامًا

“হে আহমদ! সুসংবাদ লও। সুন্নতের উপর আমল করার কারণে আল্লাহ তাআলা তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তোমাকে ইমাম বানিয়ে দিয়েছেন।”

আমি সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন—আমি জিবরাঈল।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকেও তাঁর প্রিয় হাবীবের পরিপূর্ণ ইত্তেবা ও অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন।

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

চতুর্থ হক

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হুকুম ও সুন্নত তরক না করা

সুন্নত ত্যাগ করলে কঠিন আযাবের ধমকি

এ কথা যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যাবতীয় হুকুম ও নির্দেশের এত্তেবা করা অপরিহার্য, তখন এতে এটাও নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হুকুম ও নির্দেশ তরক করা এবং কোন সুন্নতের বিরোধিতা করা সুস্পষ্টরূপে নাজায়েয। দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে বরবাদী ও দুঃখ-কষ্টের কারণ হবে। আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের জন্য (যারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হুকুম, নির্দেশ, বাণী ও সুন্নত তরক করবে এবং এগুলোর বিরোধিতা করবে) কঠিন আযাবের ধমকি দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে—

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهٖٓ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

অর্থ ঃ "সুতরাং যারা আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের এই ভয় হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়ে কিংবা তাদের উপর কোন যন্ত্রণাময় আযাব নাযিল হয়ে পড়ে।" (নূর ঃ ৬৩)

পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهٖ مَا تَوَلّٰى وَنُصْلِهٖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ○

"আর যে ব্যক্তি রাসূলের বিরোধিতা করবে তার নিকট সত্য বিষয় প্রকাশিত হওয়ার পর এবং মুসলমানদের পথ পরিত্যাগ করে অন্যপথ অবলম্বন করবে, আমি তাকে করতে দেব সে যা কিছু করে এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব ; আর এটা হল নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থান।" (নিসা ঃ ১১৫)

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিরোধিতা করবে এবং দ্বীনের ব্যাপারে মনগড়া নতুন মত ও বেদআত সৃষ্টি করবে, তাদের সম্পর্কে হাদীস পাকেও কঠোর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলে খোদা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হাশরের ময়দানে কিছু সংখ্যক লোককে আমার হাউজে কাওসারের নিকট আসতে বাধা দেওয়া হবে তখন—

فَاُنَادِيْهِمْ اَلَا هَلُمَّ اَلَا هَلُمَّ فَيُقَالُ اِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ فَسُحْقًا فَسُحْقًا فَسُحْقًا

"আমি তাদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকব তোমরা এদিকে আস, তোমরা এদিকে আসে, তোমরা এদিকে আস। তখন (ফেরেশতাদের পক্ষ হতে) বলা হবে এই লোকেরা আপনার (ওফাতের) পর দ্বীন ও সুন্নতের মধ্যে পরিবর্তন করেছে এবং বেদআত সৃষ্টি করেছে। তখন আমি বলব এমন লোক দূর হোক, দূর হোক, দূর হোক।"

হায় আফসোস! প্রতিটি মুমিন, যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের শাফাআত লাভের আশায় বুক বেঁধে আছে সেই রাহমাতুল্লিল আলামীন, সকল পাপীর শাফাআতকারীই যখন দূরে সরিয়ে দিবেন তখন এদের স্থান কোথায় হবে?

শায়খাইন অর্থাৎ হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ) হতে হযরত আনাস (রাযিঃ) একটি দীর্ঘ হাদীসের এক স্থানে বর্ণনা করেছেন—

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ .

"রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে আমার নয়।" অর্থাৎ সে আমার জামাআতভুক্ত নয় বা সে আমার অনুসরণকারী নয় বা আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক নাই। (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ২৭)

একটু চিন্তা করে দেখুন! যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ কথা বলবেন তার পরিণতি কি হতে পারে।

অন্য এক হাদীসে পাকে এসেছে—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন বিষয় আবিস্কার

করল যা এতে নাই (অর্থাৎ দ্বীনের মূল ভিত্তি কুরআন ও হাদীসে নাই) তা প্রত্যাখ্যাত। (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ২৭)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত গোলাম হযরত আবূ রাফে' (রাযিঃ)–এর বর্ণিত হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—"আমি তোমাদের মধ্যে কাউকে যেন এমন না পাই যে, সে আপন আসনে উপবিষ্ট আর আমার কোন হুকুম তার কাছে পৌছে, কিংবা আমার কোন নিষেধাজ্ঞা তার কাছে পৌছে, অতঃপর সে বলে যে, কুরআনে এরূপ কোন কথা আছে বলে আমার জানা নাই, আমি তো কুরআনেরই অনুসরণ করি।"

অপর এক হাদীসে এ কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

وَاِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالٰى ـ

"নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (পবিত্র হাদীসে) যেসব জিনিস হারাম করেছেন (যেগুলোর হুকুম পবিত্র কুরআনে নাই) এগুলো তেমনি হারাম যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা (পবিত্র কুরআনে) হারাম করেছেন। (কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার হুকুমেই সেগুলোকে হারাম করেছেন।)" (জমউল ফাওয়ায়েদ, খণ্ড ১, পৃঃ ১৭)

হযরত উমর (রাযিঃ)–এর তৌরীত পাঠের ঘটনা

হযরত জাবের (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) তাওরাতের একটি নুসখা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হন এবং আরয করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা তাওরাতের নুসখা। একথা শ্রবণ করে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ থাকেন, কোন জওয়াব দেন নাই। আর হযরত উমর (রাযিঃ) নুসখাটি খুলে পড়তে শুরু করেন। এসময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা মুবারকে (অসন্তুষ্টির) চিহ্ন ফুটে উঠতে থাকে। বিষয়টি হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)–এর চোখে পড়ল। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা দেখে হযরত উমরকে লক্ষ্য করে বললেন—

ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرٰى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"ক্রন্দনকারিণীগণ তোমার জন্য কাঁদুক, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যোতির্ময় চেহারায় অসন্তুষ্টির কিরূপ চিহ্ন ফুটে উঠেছে?"

হযরত আবু বকর (রাযিঃ)–এর এই কথা শুনে হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মুবারকের প্রতি তাকিয়ে অসন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পেলেন। তাঁর আত্মা কেঁপে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন—

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَ غَضَبِ رَسُوْلِهٖ رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا

"আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আল্লাহ আমাদের 'রব্ব' তাঁর প্রতি আমরা রাজী ও সন্তুষ্ট, দ্বীন হিসাবে ইসলাম ও নবী হিসাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মানতে আমরা রাজী, তাঁর প্রতি আমরা সন্তুষ্ট।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسٰى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا لَا تَّبَعَنِىْ ـ مشكوة المصابيح

"সেই মহান সত্তার কসম, যার কুদরতের হাতে আমার জীবন। যদি হযরত মূসা আলাইহিস সালামও তোমাদের নিকট আগমন করেন এবং তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ কর তবুও তোমরা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। যদি মূসা আলাইহিস সালাম জীবিত থাকতেন তবে তিনিও আমারই ইত্তেবা ও অনুসরণ করতেন।"(মেশকাত শরীফ, কিতাবুল ইলম, পৃঃ ৩২)

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)–এর উক্তি

আবু দাউদ শরীফে হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রাযিঃ)–এর একটি উক্তি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন—

لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلُ بِهٖ اِلَّا
عَمِلْتُ بِهٖ اِنِّىْ اَخْشٰى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِهٖ اَنْ اَزِيْغَ

"রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব আমল করতেন, এর প্রতিটি আমল অবশ্যই আমি করব। যদি আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশিত কোন একটি আমলও ছেড়ে দেই তাহলে আমার আশংকা হয় আমি গোমরাহ হয়ে যাবে।"

উপরোক্ত হাদীস ও রেওয়ায়াতগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন হুকুম ও বাণী তরক করা এবং এগুলোর খেলাপ করার বিন্দুমাত্র অবকাশও নাই। আর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন একটি সুন্নত তরক করাও সুনিশ্চিত গুমরাহী, ধ্বংস ও বরবাদীর কারণ। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিরোধিতা করা হতে হেফাযত করুন এবং সুন্নতের পুরাপুরি এত্তেবা ও অনুসরণ করার তওফীক দান করুন। আমীন ! ইয়া রাব্বাল আলামীন !

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

পঞ্চম হক

মহব্বতে রাসূল (সাঃ)

আল্লাহ তাআলার প্রিয় হাবীব সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি (আমার পিতা-মাতা, আমার দেহ ও আত্মা তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত) প্রাণগত মহব্বত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

অর্থ ঃ আপনি বলে দিন, যদি তোমাদের পিতৃবর্গ এবং তোমাদের পুত্রগণ এবং তোমাদের ভ্রাতাগণ এবং তোমাদের স্ত্রীগণ এবং তোমাদের স্বগোত্র, আর সে সকল ধনসম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ এবং সেই ব্যবসায় যাতে তোমরা মন্দা পড়ার আশংকা করছ, আর সেই গৃহগুলো যা তোমরা পছন্দ করছ (যদি এইসব) তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে এবং তাঁর রাস্তায় জেহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা প্রতীক্ষা করতে থাক এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তাআলা নিজের নির্দেশ (শাস্তি) পাঠিয়ে দেন; আর আল্লাহ তাআলা আদেশ অমান্যকারীদেরকে তাদের উদ্দিষ্ট স্থল পর্যন্ত পৌছান না।" (তওবা ঃ ২৫)

এই পবিত্র আয়াত সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। তাঁর প্রতি এই মহব্বত ও ভালবাসা নিজের সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, পরিবার-বংশ, আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ঘর-বাড়ী সব কিছুর উপর প্রবল ও শক্তিমান হতে হবে। যদি কারো মধ্যে তাঁর প্রতি এই মহব্বত ও ভালবাসা পরিপূর্ণ না থাকে বরং অন্য কোন কিছুর মহব্বত বেশী ও প্রবল হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে স্বীয় কঠিন শাস্তি দেওয়ার সংবাদ দিয়েছেন এবং এরূপ ব্যক্তিকে ভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট,

গুনাহগার ও ফাসেক বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আনাস (রাযিঃ)-এর বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে—

أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

"নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সকল মানুষ হতে অধিক প্রিয় হব।"

এই পবিত্র হাদীসেও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, ঈমান প্রমাণিত হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালবাসা থাকা একান্তই অপরিহার্য। অবশ্য মহব্বতের স্তরের মধ্যে কম-বেশী হতে পারে। যদ্দ্বারা ঈমানের স্তরের মধ্যেও প্রভেদ ও পার্থক্য হবে। কিন্তু অন্তরের মধ্যে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালবাসা দৃঢ়মূল হয়ে যাওয়াই আসল উদ্দেশ্য।

হযরত আনাস(রাযিঃ) হতেই এই মর্মে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে—

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ تَعَالٰى وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ ـ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির মধ্যে তিনটি জিনিস থাকবে সে (স্বীয় অন্তরে) ঈমানের স্বাদ অনুভব করবে। এক, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল (সাঃ) তার নিকট দুনিয়ার সব কিছু হতে অধিক প্রিয় হবেন। দুই, যদি কোন মানুষকে মহব্বত করে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করবে (অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়)। তিন, কুফর অবস্থায় ফিরে যাওয়াকে এমনই অপছন্দ করে যেমন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" (বুখারী শরীফ, পৃঃ ৭)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে—

اَنَّهٗ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ اِلَّا مِنْ نَفْسِى الَّتِىْ بَيْنَ جَنْبَىَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُّؤْمِنَ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَّفْسِهٖ فَقَالَ عُمَرُ وَالَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ نَّفْسِى الَّتِىْ بَيْنَ جَنْبَىَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاٰنَ يَا عُمَرُ

"তিনি একদা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করেন, (ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম!) আপনি আমার নিকট আমি ব্যতীত আর সব কিছু হতে অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তার নিকট তার নিজ হতেও আমি অধিক প্রিয় হই। অতঃপর হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, কসম সেই মহান সত্তার যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, এখন আপনি আমার নিকট আমার নিজ অপেক্ষাও অধিক প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে উমর! হাঁ, এখন (তোমার ঈমান) পরিপূর্ণ হয়েছে।"

হযরত সাহ্‌ল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী (রহঃ)-এর এরূপ উক্তি বর্ণিত আছে—

مَنْ لَمْ يَرَ وِلَايَةَ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ فِىْ جَمِيْعِ الْاَحْوَالِ وَيَرٰى نَفْسَهٗ فِىْ مِلْكِهٖ لَا يَذُوْقُ حَلَاوَةَ السُّنَّةِ لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ نَّفْسِهٖ

"যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃত্বকে সর্বাবস্থায়ই নিজের উপর অপরিহার্যরূপে গ্রহণ না করবে এবং স্বীয় নফসকে নিজের এখতিয়ারাধীন মনে করবে, সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না। কেননা, হযরত নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি সে পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার নফস হতেও আমাকে অধিক ভালবাসবে।"

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা ও মহব্বত রাখা একান্ত অপরিহার্য ও ফরয। আল্লাহ পাক অনুগ্রহ করে আমাদের সকলকে তাঁর ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালবাসা নসীব করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি ভালবাসার সওয়াব ও ফযীলত

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَلٰوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلٰكِنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ ـ

"হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামত কবে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেয়ামতের জন্য তুমি কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, এর জন্য তুমি এত আগ্রহ প্রকাশ করছ।)? লোকটি আরয করল, এইজন্য আমি নামায, রোযা ও সদকা খয়রাতের কোন সমৃদ্ধ ভাণ্ডার তো গড়ে তুলতে পারি নাই, তবে হাঁ, আমার একটি সম্পদ আছে তা হল, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি (দুনিয়া ও আখেরাতে) তাঁর সাথেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস ও মহব্বত কর।"

(জমউল ফাওয়ায়েদ, খণ্ড ২, পৃঃ ১৪৮)

আল্লাহু আকবার! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ও

সাহচর্য লাভ কত ভালবাসার বস্তু! হযরত আনাস (রাযিঃ) বলেন, আমরা কোন জিনিসের দ্বারা এত অধিক আনন্দিত হই নাই যত অধিক আনন্দিত হয়েছি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'তুমি তাঁর সংগেই থাকবে যাকে তুমি ভালবাস' এই উক্তির দ্বারা।

(জমউল ফাওয়ায়েদ, খণ্ড ২, পৃঃ ১৪৮)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ قُدَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ هَاجَرْتُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُهٗ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَاوِلْنِيْ يَدَكَ اُبَايِعْكَ فَنَاوَلَنِيْ يَدَهٗ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ اُحِبُّكَ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ

"হযরত সাফওয়ান ইবনে কুদামা (রাযিঃ) বলেন, আমি হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হয়ে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার হস্ত মুবারক এগিয়ে দিন, আমি আপনার পবিত্র হস্তে বাইআত করব। তিনি তাঁর পবিত্র হস্ত মুবারক এগিয়ে দেন, আমি বাইআত করি। অতঃপর আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, মানুষ তো তার সঙ্গেই থাকবে, যাকে সে ভালবাসে।"

এক সাহাবীর মহব্বতে রাসূলের ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ), হযরত আনাস (রাযিঃ) ও হযরত আবু যর (রাযিঃ) হতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার সওয়াব ও ফযীলতের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ বিষয়ে তাবরানী নিম্নোক্ত হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন।

اَنَّ رَجُلًا اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اَهْلِيْ وَمَالِيْ وَاِنِّيْ لَاَذْكُرُكَ فَمَا اَصْبِرُ حَتّٰى اَجِيْئَ فَاَنْظُرَ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ ذَكَرْتُ مَوْتِيْ وَمَوْتَكَ فَعَرَفْتُ اَنَّكَ اِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّيْنَ

وَاِنْ دَخَلْتُهَا لَا اَرَاكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَ الصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا فَدَعَا بِهٖ فَقَرَاَهَا عَلَيْهِ ۔

"এক ব্যক্তি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ হতে অধিক ভালবাসি। আর আপনার সম্মুখে না থাকা অবস্থায় যখন আপনার কথা মনে পড়ে তখন আপনার খেদমতে এসে দু'চোখ ভরে আপনার পবিত্র সৌন্দর্য না দেখা পর্যন্ত আমি স্থির থাকতে পারি না। আর আমি যখন আমার এবং আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ করি তখন আমার মানসপটে ভেসে উঠে—আপনি অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামগণের সঙ্গে বেহেশতের সুউচ্চ স্থানে অবস্থান করবেন। আর আমি বেহেশতে প্রবেশ করেও নিম্নস্তরে অবস্থান করার কারণে আপনার অনুপম সৌন্দর্য দেখতে পারব না। এমতাবস্থায় কিভাবে ধৈর্য ধারণ করব, আর সে জান্নাতেই বা কি মজা হবে? তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর সান্ত্বনার জন্য এই আয়াত নাযিল করেন যে, "যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে তারা সেসব লোকদের সঙ্গে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কেরাম, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালেহীনদের সঙ্গে। এইসব লোক কতই না উত্তম সঙ্গী হবেন।" অতঃপর হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তিকে ডেকে আনলেন এবং এই আয়াত পড়ে শুনিয়ে দিলেন।

অন্য এক হাদীসে এই পবিত্র আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত হয়েছে—

كَانَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَنْظُرُ اِلَيْهِ لَا يَطْرِقُ فَقَالَ مَا بَالُكَ قَالَ بِاَبِيْ اَنْتَ وَ اُمِّيْ اَتَمَتَّعُ مِنَ النَّظَرِ اِلَيْكَ فَاِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَفَعَكَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِتَفْضِيْلِهٖ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ الْاٰيَةَ

"হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। সে সারাক্ষণ অপলক নেত্রে কেবল আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের প্রতিই চেয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্য সে তার দৃষ্টি এদিক-সেদিক করছিল না। লোকটির এই অবস্থা দেখে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার কি হলো! অপলক নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ! লোকটি আরয করল, (ইয়া রাসূলাল্লাহ!) আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোন! আমি প্রাণ ভরে আপনার অনুপম সৌন্দর্য দেখে হৃদয় মন শীতল করছি। কেননা, আল্লাহ তাআলা আপনাকে সকল সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বাধিক ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। কিয়ামতের ময়দানেও তিনি আপনাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা ও মাকামে পৌছে দিবেন। সেখানে তো আর আপনার এই দীপ্তিমান ও প্রোজ্জ্বল চেহারা মুবারক দেখতে পাব না। তাই আপনাকে দেখে দেখে সেই বিরহ ব্যাকুল মনের অতৃপ্ত স্বাদ পূরণ করছি। অতঃপর আল্লাহ তাআলা উক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত—

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَحَبَّنِيْ كَانَ مَعِيْ فِي الْجَنَّةِ

"হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করবে, ভালবাসবে, সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।"

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেহেশতে সান্নিধ্য ও সাহচর্য লাভ কত আকর্ষণীয় ও প্রাণ উৎসর্গ করার মত নেয়ামত! আল্লাহ পাক তাঁর ফযল ও করমে আমাদেরকে তাঁর ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অফুরন্ত মহব্বত ও ভালবাসা দান করে বেহেশতে তাঁর প্রিয় হাবীবের সাহচর্য ও সান্নিধ্য নসীব করুন। আমীন!

রাসূল (সাঃ)-এর প্রতি সালফে সালেহীনদের মহব্বত ও ভালবাসার কয়েকটি ঘটনা

হযরত সাহাবায়ে কেরাম, সম্মানিত তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, আওলিয়া কেরাম, উলামা ও মাশায়েখ কেরামের সকলেই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত প্রেম ও ভালবাসায় বিভোর ও মাতোয়ারা ছিলেন। স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই তাঁর প্রতি এই প্রেম ও ভক্তির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। যেমন এক পবিত্র হাদীসে এসেছে—

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ اَشَدِّ اُمَّتِىْ حُبًّا نَاسٌ يَكُوْنُوْنَ بَعْدِىْ يَوَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ رَاٰنِىْ بِاَهْلِهٖ وَمَالِهٖ.

"হযরত আবু হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি অধিক মহব্বতকারী লোক তারাই হবে, যারা আমার পরে আসবে। তারা স্বীয় সন্তান-সন্ততির বিনিময়ে হলেও (যদি সম্ভব হত) আমাকে দেখার আকাংখা পোষণ করবে।" (মিশকাত শরীফ, পৃঃ ৫৮৩)

হাদীসে উল্লেখিত এই সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের রাসূলপ্রেমের সব ঘটনাবলী বর্ণনা করা অসম্ভব ব্যাপার। এখানে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হল।

হযরত উমর (রাযিঃ)-এর মহব্বতে রাসূল (সঃ)

হযরত উমর (রাযিঃ)-এর প্রেম উদ্বেলিত উক্তি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন—

لَاَنْتَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ! নিঃসন্দেহে আপনি আমার নিকট আমার নিজ হতেও অধিক প্রিয়।"

বস্তুতঃ হযরত উমর (রাযিঃ)-এর পুরা যিন্দেগীই তাঁর এই বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়দীপ্ত উক্তির বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিল।

হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ)-এর মহব্বতে রাসূল (সঃ)

হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন—

مَا كَانَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আমার নিকট আর কোন মানুষই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অধিক প্রিয় ছিল না।"

হযরত খালেদ (রাযিঃ)-এর মহব্বতে রাসূল (সঃ)

হযরত আবদাহ্ বিনতে খালেদ ইবনে সাফওয়ান (রাযিঃ) তাঁর পিতা হযরত খালেদ (রাযিঃ) সম্পর্কে বলেন, আমার শ্রদ্ধেয় পিতা সর্বদাই রাতে ঘুমানোর আগে বিছানায় বসে বসে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁদের প্রতি তাঁর মহব্বত ও ভালবাসার আলোচনা করতেন। প্রত্যেকের নাম বলে বলে এক অনাবিল স্বাদ ভোগ করতেন। তিনি বলতেন—

هُمْ اَصْلِىْ وَفَصْلِىْ وَاِلَيْهِمْ يَحِنُّ قَلْبِىْ طَالَ شَوْقِىْ اِلَيْهِمْ فَعَجِّلْ رَبِّىْ قَبْضِىْ اِلَيْكَ

"এই মহামানবগণই আমার (ঈমান, আকীদা-বিশ্বাস ও দ্বীনের) মূল ও শাখা-প্রশাখা। (অথবা তাঁর এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, এই মহামানবগণের বয়োজ্যেষ্ঠগণ আমার পিতৃতুল্য এবং কনিষ্ঠরা আমার সন্তানতুল্য) আমার হৃদয়-মন তাদের দিকে ছুটে যেতে যাচ্ছে, তাদের সান্নিধ্য লাভের আকাংখা তীব্রতর হয়ে উঠছে। ওগো আমার পরওয়ারদিগার! আমি যে বিরহ যাতনা সইতে পারছি না! আপনি আমার দেহের সাথে আত্মার বাঁধন ছিন্ন করে অতি দ্রুত আমাকে তাদের সান্নিধ্যে পৌঁছে দিন।"

এরূপ করুণ আর্তনাদ করতে করতেই তিনি ঘুমিয়ে যেতেন।

হযরত আবু বকর (রাযিঃ)-এর উক্তি

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেন—

وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَاِسْلَامُ اَبِىْ طَالِبٍ كَانَ اَقَرَّ لِعَيْنِىْ مِنْ اِسْلَامِهٖ يَعْنِىْ اَبَاهُ اَبَا قُحَافَةَ وَذٰلِكَ اَنَّ اِسْلَامَ اَبِىْ طَالِبٍ كَانَ اَقَرَّ لِعَيْنِكَ

"সেই মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। আমার পিতা আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণ করার থেকে আপনার চাচা আবু তালেবের ইসলাম গ্রহণ করার দ্বারা আমি অধিক খুশী ও আনন্দিত

হতাম। কেননা, আবু তালেবের ইসলাম কবূল করার দ্বারা আপনি অধিক খুশী হতেন।”

হযরত উমর (রাযিঃ)-এর উক্তি

এইভাবে হযরত উমর (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ)কে বলেছিলেন—

اَنْ تُسْلِمَ اَحَبُّ اِلَيَّ مِنْ اِسْلَامِ الْخَطَّابِ لِاَنَّ ذٰلِكَ اَحَبُّ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“আপনার ইসলাম কবূল করা আমার নিকট আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম কবূল করার চেয়েও অধিক পছন্দনীয় ছিল। এর কারণ এই ছিল যে, আপনার ইসলাম কবূল করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অধিক পছন্দনীয় ছিল।”

এক আনসারী মহিলার মহব্বত

ইমামুল মাগাযী মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে বহু মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদাতের সংবাদও প্রচারিত হয়ে যায়। এই যুদ্ধে এক আনসারী মহিলার ভাই ও স্বামী শাহাদত লাভ করে। আনসারী মহিলাকে তাঁদের শাহাদতের সংবাদ দেওয়া হল। মহিলা বললেন, আগে বল, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেমন আছেন? লোকেরা বলল, আল-হামদুলিল্লাহ! তিনি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন। আনসারী মহিলা বললেন—

اَرِنِيْهِ حَتّٰى اَنْظُرَ اِلَيْهِ

“তিনি কোথায় আছেন আমাকে তাঁর অবস্থানটা দেখিয়ে দাও। আমি তাঁর পবিত্র চেহারা মুবারক দেখতে চাই।”

তাঁকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থান বলে দেওয়া হল। মহিলা এসে স্বচক্ষে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলেন এবং নিশ্চিন্ত হলেন। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরাপদ ও সুস্থ দেখে অবলীলায় তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এল—

كُلُّ مُصِيْبَةٍ بَعْدَكَ جَلَلٌ

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি নিরাপদ ও সুস্থ থাকার পর যে কোন মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট অতি সহজ ও সাধারণ।”

হযরত আলী (রাযিঃ)-এর উক্তি

হযরত আলী (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আপনাদের কেমন মহব্বত ও ভালবাসা ছিল? তিনি জওয়াবে বলেন—

كَانَ وَاللّٰهِ اَحَبَّ اِلَيْنَا مِنْ اَمْوَالِنَا وَاَوْلَادِنَا وَاٰبَائِنَا وَاُمَّهَاتِنَا وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الظَّمَاِ .

“আল্লাহর কসম! রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট নিজের ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা ও তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত ব্যক্তির পানি প্রাপ্তির চেয়েও অধিক প্রিয় ছিলেন।”

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ খালীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) এক রাত্রে তাঁর অভ্যাস অনুযায়ী মানুষের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য মদীনার অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াতে ছিলেন। এসময় তিনি দেখতে পেলেন, একটি ঘরে বাতি জ্বলছে এবং এক বুড়ী বসে বসে পশম ধুনানী করছে আর এই কবিতা পড়ছে—

عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلٰوةُ الْاَبْرَارِ * صَلّٰى عَلَيْهِ الطَّيِّبُوْنَ الْاَخْيَار

قَدْ كُنْتَ قَوَّامًا بُكًى بِالْاَسْحَارِ * يَا لَيْتَ شِعْرِىْ وَالْمَنَايَا اَطْوَار

هَلْ تَجْمَعُنِىْ وَحَبِيْبِىْ الدَّارُ

“মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নেককারদের দরূদ বর্ষিত হোক। আল্লাহ তাআলার পবিত্র ও প্রিয় বান্দাগণ সর্বদাই তাঁর প্রতি দরূদ পড়বে। নিঃসন্দেহে (হে প্রিয় রাসূল!) আপনি নিঝুম রজনীতে অধিক নামায আদায়কারী ও রুকুকারী ছিলেন। হায়! আমি যদি জানতে পারতাম! কোন মিলনক্ষেত্র আমাকেও আমার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দিবে কিনা? অথচ আমল ও কর্মের ব্যবধানে মানুষের মৃত্যু হয় বিভিন্নরূপে।"

হযরত উমর (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রেম ও ভালবাসার এই মর্মভেদী সুর মূর্ছনায় স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সেখানেই কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাতে থাকেন। চোখের পানি যেন বাঁধভাঙ্গা স্রোতের ন্যায় গড়িয়ে পড়ছে। এই ভাবেই কেটে গেল বহুক্ষণ।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর পা অবশ হয়ে গিয়েছিল। একরাত্রে তিনি ঘুমিয়ে আছেন, এমন সময় স্বপ্নে দেখতে পেলেন, কে যেন তাঁকে বলছে, মানুষের মধ্যে যিনি আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি তাঁকে স্মরণ করুন। এ কথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)-এর অন্তরে মহব্বতের ঢেউ জেগে উঠল। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, আয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! তৎক্ষণাৎ তাঁর পায়ের অবশ অবস্থা দূর হয়ে গেল। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেলেন।

হযরত বেলাল (রাযিঃ)-এর মৃত্যুর সময় আনন্দ-উচ্ছাস

হযরত বেলাল (রাযিঃ)-এর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে আসলে তাঁর স্ত্রী বলতে থাকেন,হায় কি কঠিন মুসীবত! হযরত বেলাল (রাযিঃ) স্ত্রীর এই উক্তি শুনে বলে উঠলেন, আহ্ কি সুখ! কি আনন্দ! এটাতো দুঃখ-কষ্ট প্রকাশের সময় নয় বরং এটা হলো খুশী ও আনন্দ প্রকাশের সময়। কেননা,

غَدًا نَلْقَى الْاَحِبَّةَ * مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ

"কাল প্রিয় বন্ধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথীদের সাথে মিলিত হব। (এর চেয়ে অধিক খুশী ও আনন্দের ব্যাপার আর কি হতে পারে?)"

রওজা-পাক দেখেই এক মহিলার ইনতেকাল

একবার জনৈকা মহিলা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)-এর নিকট এসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক দেখার অনুরোধ করলেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) ঘরের দরজা খুলে রাসূলে পাক

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারক দেখিয়ে দিলেন। মহিলা রওজা মুবারকের যিয়ারত করলেন এবং সকরুণ আর্তনাদে কাঁদতে লাগলেন। এত অধিক কাঁদলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে শূলি দেওয়ার সময় জিজ্ঞাসাবাদ

হযরত যায়েদ ইবনে দাছিনা (রাযিঃ) রজী'র ঐতিহাসিক ঘটনায় বন্দী হয়েছিলেন। অতঃপর তাঁকে মক্কার কাফেরদের নিকট বিক্রয় করে দেওয়া হল। তাঁকে হত্যা করার জন্য যখন হরম শরীফের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল তখন আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ইবনে উমাইয়া (যিনি তখনও মুসলমান হন নাই) বলেছিল, যায়েদ! তোকে তোর পরিবার-পরিজনের সাথে সুখে-শান্তিতে থাকার জন্য ছেড়ে দিয়ে তোর পরিবর্তে যদি মুহাম্মদকে এনে হত্যা করা হয় তাহলে এটা কি তুই পছন্দ করবি না? হযরত যায়েদ (রাযিঃ) তখন জওয়াব দিয়েছিলেন—

وَاللّٰهِ مَا اُحِبُّ اَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاٰنَ فِىْ مَكَانِهِ الَّذِىْ هُوَ فِيْهِ تُصِيْبُهُ شَوْكَةٌ وَاِنِّىْ جَالِسٌ فِىْ اَهْلِىْ -

"আল্লাহর কসম! আমি তো এটাও বরদাস্ত করতে পারব না যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে অবস্থানরত আছেন সেখানে তাঁর পা মুবারকে একটি সামান্য কাঁটা ফুটুক আর আমি আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে সুখে থাকি।"

নবী প্রেমিক হযরত যায়েদ (রাযিঃ)-এর ভক্তিপূর্ণ প্রত্যয়দীপ্ত জওয়াব শুনে আবু সুফিয়ান বলতে লাগল—

مَا رَأَيْتُ اَحَدًا يُحِبُّ اَحَدًا كَحُبِّ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"মুহাম্মদকে তাঁর সাথীরা যত গভীরভাবে ভক্তি করে ও ভালবাসে আর কারো প্রতি তার সাথীদের এত অধিক ভালবাসতে দেখি নাই।"

এই ঘটনাটিকে কেউ কেউ হযরত খুবাইব ইবনে আদী (রাযিঃ) সম্পর্কেও বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কোন মহিলা হিজরত করে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তিনি তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন যে, সে কি কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার জন্যই হিজরত করেছে, না তার স্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বা নতুন জায়গা ভ্রমণ করার জন্য বা এরূপ আরো অন্য কোন উদ্দেশ্যে হিজরত করেছে?

আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইরের শাহাদাত ও ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর উক্তি

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ)কে শহীদ করে তাঁর লাশ গাছের ডালে টানিয়ে রেখেছিল তখন এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেছিলেন—

كُنْتَ وَاللّٰهِ فِيْمَا عَلِمْتُ صَوَّامًا قَوَّامًا تُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"আল্লাহর কসম! আমার জানা মতে আপনি ছিলেন অধিক রোযা পালনকারী ও নামায আদায়কারী। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের প্রতি ছিল আপনার গভীর মহব্বত ও ভালবাসা।"

মোটকথা, সকল সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহেদীন, আওলিয়ায়ে কেরাম ও মুমিনীন সকলেই হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও ভালবাসার রঙে রঙ্গিন ছিলেন, তাঁর প্রেমে ছিলেন বিভোর ও নিমগ্ন। আর তাঁর ভালবাসায় এরূপ মত্ত না হয়েও তো কোন গত্যন্তর নাই। কেননা, ঈমানের অমূল্য সম্পদের জন্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা রাখা একান্ত অপরিহার্য। দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সফলতা লাভের একমাত্র মাধ্যম ও ওসীলা। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে তাঁর ও তাঁর প্রিয় হাবীবের পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালবাসা নসীব করুন। আমীন!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের নিদর্শন

প্রতিটি জিনিসেরই এমন কিছু আলামত, নিদর্শন ও চিহ্ন থাকে যদ্দ্বারা সেই জিনিসটির ভাল মন্দ ও আসল নকলের পরিচয় জানা ও বুঝা যায়। এমনিভাবে প্রকৃত মহব্বত ও ভালবাসারও কিছু আলামত ও নিদর্শন রয়েছে। তা হল, মানুষ যখন কাউকে মহব্বত করে ও ভালবাসে তখন সে তার ভালবাসার মানুষটিকে নিজের জীবনের উপরেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যে কোন বিষয়ে সে তার প্রেমাস্পদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে। তার সন্তুষ্টির বিপরীত সে কোন কাজ করে না। যদি কারো মধ্যে এই সকল নিদর্শন পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সে তার মহব্বত ও ভালবাসায় দৃঢ় ও চরম সত্যবাদী। অপর দিকে যদি কারো মধ্যে এই নিদর্শন দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে সে তার মহব্বত ও ভালবাসার দাবীতে নির্লজ্জ মিথ্যাবাদী। যেমন জনৈক কবির ভাষায়—

وَكُلٌّ يَدَّعِيْ وَصْلًا بِلَيْلٰى * وَلَيْلٰى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَا

"প্রত্যেক প্রেমিকই লাইলার একান্ত ঘনিষ্ঠতা লাভের দাবী করে। অথচ লাইলা এদের কারো জন্যই এই দাবীর স্বীকৃতি দেয় না।"

এমনিভাবে যে কোন ব্যক্তিই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার দাবী করতে পারে কিন্তু সত্যিকার প্রেমিক তাঁকেই মনে করা হবে যার মধ্যে মহব্বতের আলামত ও নিদর্শন পাওয়া যাবে।

হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের কয়েকটি আলামত ও নিদর্শন এখানে বর্ণনা করা হল, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের সম্পর্কে আন্দাজ–অনুমান করতে পারে যে, আমার মধ্যে এর কয়টি নিদর্শন রয়েছে। আঁ–হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার মহব্বত ও ভালবাসাই বা কি পরিমাণ আছে।

এত্তেবায়ে শরীয়ত

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আনিত শরীয়তের পরিপূর্ণ পায়রবী করতে হবে। এটা হুযূরের প্রতি মহব্বতের আলামত। সুতরাং শরীয়তের এত্তেবা যার মধ্যে নাই, তার মুখে হুব্বে রাসুলের দাবী হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত মহব্বতের জন্য এত্তেবায়ে শরীয়ত অবশ্যই থাকতে হবে।

এত্তেবায়ে সুন্নত

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি বরকতময় সুন্নতের উপর আমল করতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি অবস্থায় তাঁর হুকুম-আহকাম ও নির্দেশাবলীর ইত্তেবা ও অনুসরণ করতে হবে। তিনি ওয়াজিব বা মুস্তাহাব যে কোনভাবে যে সকল বিষয়ের হুকুম করেছেন তা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। যে সকল বিষয় হতে নিষেধ করেছেন সতর্কতার সাথে সেগুলো হতে বেঁচে থাকতে হবে।

রাসূল (সঃ)-এর আদব করা

অভাব-অনটন, সম্পদ-প্রাচুর্য, সুখ-দুঃখ, শোক ও আনন্দ সর্বাবস্থায়ই আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও মর্যাদার খেয়াল রাখতে হবে। জীবনের সর্বাবস্থায় তাঁর সুমহান আদর্শ-চরিত্র অনুশীলন করতে হবে। কেননা, পবিত্র কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَاللّٰهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"(হে রসূল!) আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহর সঙ্গে ভালবাসা রাখ, তবে তোমরা আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের যাবতীয় গুনাহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ খুব ক্ষমাশীল বড় করুণাময়।" (আলি ইমরান ঃ ৩১)

রাসূল (সঃ)-এর হুকুমকে নিজের কামনা-বাসনার উপর প্রাধান্য দেওয়া

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিষয় করতে হুকুম করেছেন বা উদ্বুদ্ধ করেছেন এইগুলো করার ব্যাপারে নফসের আকাংখা ও প্রবৃত্তির চাহিদার উপরে প্রাধান্য দেওয়া। কেননা, এই প্রসঙ্গে হযরত আনসার সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসায় কুরআন করীমে ইরশাদ হয়েছে—

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا
يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ وقف

"আর তাদের (ও হক রয়েছে) যারা দারুল ইসলামে (অর্থাৎ মদীনায়) এবং ঈমানের মধ্যে তাদের (মুহাজিরদের আগমনের) পূর্ব হতে অটল রয়েছে, যারা তাদের নিকট হিজরত করে আসে, তাদেরকে এরা ভালবাসে, আর মুহাজিরগণ যা প্রাপ্ত হয়, এরা তজ্জন্য নিজেদের মনে কোন ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দান করে, যদিও তারা ক্ষুধার্তই থাকে।" (হাশর ঃ ৯)

আনসারী সাহাবীগণ

সাইয়্যেদুল মুরসালীন হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজেরীনদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছিলেন। ভ্রাতৃত্বের এই সম্পর্ক সাহাবায়ে কেরামদের মনে অত্যন্ত গভীর ও দৃঢ় রেখাপাত করেছিল। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের প্রতি তাদের মুহাজির ভাইদের সাথে সদয় ও উত্তম আচার-ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর এই উদ্বুদ্ধ করণের ফল হল এই যে, আনসারগণ মুহাজিরদের সাথে ভাইয়ের চেয়েও অধিক সুন্দর ব্যবহার করতেন। নিজেদের প্রয়োজনের উপর মুহাজির ভাইদের প্রয়োজনকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিতেন। নিজেদের ঘর-বাড়ী, সহায়-সম্পদ সবকিছুর মধ্যেই মুহাজির ভাইকে শরীক করে নেন। যার দুটি বাড়ী বা বাগান ছিল, এর মধ্যে যেটি উত্তম সেটিই মুহাজির ভাইকে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এমনকি যার দুজন স্ত্রী ছিল এবং উভয়ের মধ্যে যার প্রতি তাঁর অধিক মহব্বত ছিল সেই স্ত্রীকে তার মুহাজির ভাইয়ের নিকট বিবাহ দেওয়ার জন্য তাকে তালাক দিতে তৈরী হয়ে গেছেন। হযরত আনসারদের এই ত্যাগ ও সহমর্মিতার অবস্থাটিকেই কুরআন শরীফের এই পবিত্র আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বনী নযীর'এর সাথে যুদ্ধের প্রাপ্ত সকল মালে গণীমতই মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দেন। আনসারদের মধ্যে কেবল অতি দরিদ্র তিন ব্যক্তি আবু দুজানা সাম্মাক ইবনে খিরাসা, সাহল ইবনে হুনাইফ ও হারেস ইবনে সিম্মাহ ব্যতীত আর কাউকে কিছুই দেন নাই। এই সময় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য আনসারদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—

اِنْ شِئْتُمْ شَرَكْتُكُمْ فِىْ هٰذَا الْفَىْءِ مَعَهُمْ وَقَسَّمْتُمْ لَهُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ
وَاَمْوَالِكُمْ وَاِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ دِيَارُكُمْ وَاَمْوَالُكُمْ وَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا

"তোমরা যদি চাও তাহলে আমি তোমাদেরকে এই গনীমতের সম্পদের মধ্যে মুহাজিরদের সাথে শরীক করে দেব। আর তোমরা তোমাদের ঘর–বাড়ী ও সম্পদ মুহাজিরদের মধ্যে বন্টন করে দিবে। আর তোমরা যদি এরূপ চাও যে, তোমাদের ঘর–বাড়ী ও সহায় সম্পদ তোমাদেরই থাকুক এবং তোমরা গনীমতের প্রাপ্ত সম্পদ হতে কিছুই নেবে না (এটাও হতে পারে)।"

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রস্তাবের পর হযরত আনসারগণ আরয করলেন—

بَلْ نَقْسِمُ لَهُمْ مِنْ دِيَارِنَا وَأَمْوَالِنَا وَنُؤْثِرُهُمْ بِالْفَيْءِ عَلَيْنَا وَلَا نُشَارِكُهُمْ فِيهِ أَصْلًا۔

"(ইয়া রাসূলাল্লাহ!) বরং আমরা আমাদের ঘর–বাড়ী ও সম্পদ মুহাজির ভাইদের জন্য বন্টন করে দেই এবং গনীমতের সম্পদের ব্যাপারে তাঁদেরকেই আমাদের উপর প্রাধান্য দেই। গনীমতের সম্পদে আমরা কোন প্রকারেই তাঁদের সাথে অংশীদার হতে চাই না।"

হযরত আনসারগণ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশকে নিজেদের নফসের আকাংখা ও প্রবৃত্তির চাহিদার উপরে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁদের এই অপূর্ব ত্যাগ ও কুরবানীর জন্য পবিত্র কুরআনে তাঁদের প্রশংসা করা হয়েছে।

আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের সামনে অন্য কারও পরোয়া না করা

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুকুম মান্য করা এবং সেই অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে যদি কোন বান্দাহ অসন্তুষ্টও হয় তবুও এর কোন পরওয়া করবে না। চাই পিতা–মাতা, আপনজন সন্তান–সন্ততিই হোক না কেন—আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের মোকাবেলায় কারো সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টিরই খেয়াল করবে না। যেমন পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"মহান খালেক ও স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে কোন মাখলূক বা সৃষ্টির আনুগত্য করা জায়েয নয়।"

সুন্নত যিন্দা করা ও প্রচার করা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতসমূহ জীবন্ত ও সজীব রাখা এবং এগুলোর প্রচার প্রসারে সচেষ্ট থাকা। এটাকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাদীসে স্বীয় মহব্বতের নিদর্শন হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেন—

يَا بُنَيَّ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِيَ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَيَّ وَذٰلِكَ مِنْ سُنَّتِي وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ۔

"হে বেটা! তুমি যদি সামর্থ রাখ যে, তোমার সকাল, সন্ধ্যা এমনভাবে হোক যে, তোমার অন্তরে কারো প্রতি কোন প্রকার হিংসা–দ্বেষ না থাকুক তাহলে এরূপই কর অর্থাৎ এটাই তোমার জন্য উত্তম। অতঃপর তিনি (আরো) ইরশাদ করেন যে, হে বেটা! এটা আমার সুন্নত। যে আমার সুন্নতকে মহব্বত করল প্রকৃতপক্ষে সে আমাকেই মহব্বত করল। আর যে আমাকে মহব্বত করল সে জান্নাতে আমার সাথেই থাকবে।" (তিরমিযী, মিশকাত শরীফ)

উপরোক্ত হাদীসের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর আমল করা এবং এগুলোর ব্যাপক প্রচার প্রসার করা, অন্যের নিকট এগুলো পৌছে দেওয়া ও সুন্নতের উপর আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার নিদর্শন।

হুযূর (সঃ)কে বেশী বেশী স্মরণ করা

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লামকে অধিক পরিমাণে

স্মরণ করা। উঠা–বসা, চলা–ফেরা, নির্জনে–লোকালয়ে সর্বাবস্থায় প্রিয় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্মরণ করা। আরবী ভাষায় একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ বাক্য রয়েছে—

مَنْ اَحَبَّ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرَهُ .

"যে যাকে ভালবাসে সে অধিক পরিমাণে তাকে স্মরণ করে থাকে।" কেননা, প্রিয়তমের স্মরণ ব্যতীত কোন প্রকারেই সে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। এজন্য সে কারো তিরস্কার, ভর্ৎসনা বা নিন্দারও পরওয়া করে না। বরং কেউ যদি তিরস্কার করে তাতে সত্যিকার প্রেমিক আরো অধিক স্বাদ অনুভব করে থাকে।

عاشق بدنام كو پروائے ننگ و نام كيا
اور جو خود ناكام هو اس كو كسى سے كام كيا

"প্রেমের কলংক রেখা যার ললাটে অংকিত হয়ে গেছে তার তিরস্কার আর নিন্দাবাদের ভয় কি? যে নিন্দুক প্রেমের উত্তাল তরঙ্গমালায় ঝাঁপিয়ে পড়তে নিজেই ব্যর্থ হয়েছে তার অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন কি?"

হুযূর (সঃ)-এর আলোচনার সময় তাঁর প্রতি সম্মান

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনার সময় তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা এবং নিজের মধ্যে বিনয় ও নম্রতার ভাব ফুটিয়ে তোলা। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর অবস্থা ছিল এই যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর যখন কোন সময় তাঁর আলোচনা হত তখন তাদের মধ্যে বিনয় ও নম্রতার একটি অবর্ণনীয় ভাবের সৃষ্টি হয়ে যেত। তাঁদের দেহ কাঁপতে থাকত। মহব্বতের আতিশয্যে তাঁর বিরহ জ্বালায় বে–এখতিয়ার কাঁদতে শুরু করতেন। কোন কোন সময় কাঁদতে কাঁদতে চৈতন্য হারিয়ে ফেলতেন। যদি কোন কারণে কেউ রাগ করতেন এবং প্রচণ্ড রাগের সময়েও অন্য কেউ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন তাহলে আগুনে পানি ঢালার মত রাগ দূর হয়ে যেত এবং তাঁর মধ্যে বিনয় ও নম্রতা পয়দা হয়ে যেত। মদিনা শরীফে আজো সেই মহামনীষীদের আমলের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। কেউ

যদি রাগ করে বা কোন কঠোর কথা বলতে থাকে তখন ব্যাপকতর প্রচলন রয়েছে যে, তাঁর সম্মুখে দরূদ শরীফ পড়া হয়। এতে তৎক্ষণাৎ তাঁর রাগ দূরীভূত হয়ে যায় এবং সে বিনয় ও নম্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দেয়। তাবেঈন ও বুযর্গানে দ্বীনের অবস্থাও ছিল তদ্রূপ। যদিও কারো কারো এই অবস্থা হত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার কারণে। আর কারো কারো এই অবস্থা হত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড়ত্বের ভীতির প্রভাব, মর্যাদা ও আযমতের কারণে। এই দুইটি অবস্থাই প্রশংসনীয়। কারো কারো জন্য মহব্বত ও ভালবাসার আধিক্যের অবস্থাটি উত্তম। আর কারো কারো জন্য ভয়–ভীতি, মর্যাদা ও আযমতের আধিক্য থাকাটা উত্তম এবং তার জন্য এই অবস্থাটিই অধিক উপকারী।

রওজা শরীফ যিয়ারতের তীব্র আকাংখা

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফ যেয়ারত করার তীব্র আকাংখা থাকবে। কেননা, সত্যিকার আশেকের জন্য প্রিয়তমের স্মৃতিবিজড়িত ঘর–বাড়ী ও অন্যান্য নিদর্শনাদি দর্শন করাও কিছুটা প্রশান্তির কারণ হয়ে থাকে। জনৈক আরব্য কবি কত সুন্দর করে বিষয়টি প্রকাশ করেছেন—

اَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلٰى * اُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَا
وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِىْ * وَلٰكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَا

"আমি যখন আমার প্রিয়তমার বাড়ীর নিকট দিয়ে গমন করি তখন কখনো এ দেয়াল স্পর্শ করি কখনো সে দেয়ালে হাত বুলাই। অথচ ঘরের প্রেম আমার অন্তরকে প্রণয়াসক্ত ও মন্ত্রমুগ্ধ করে নাই। বরং ঘরের বাসিন্দা (প্রিয়তমাই) আমার অন্তরকে মুগ্ধ ও মাতোয়ারা করে দিয়েছে।"

এমনিভাবে প্রিয়তমের ঘরের নিকটবর্তী হওয়াও সান্ত্বনার কারণ হয়। যেমন জনৈক কবি বলেছেন—

تو نه آتا تيرى آواز تو آيا كرتى
گهر بهى قسمت سے تيرے گهركے برابر نه هوا

"দুর্ভাগ্যক্রমে আমার ঘরটি তোমার ঘরের সামনা-সামনি হয় নাই এবং আমার ঘরে তোমার আগমনও হয় না বটে? কিন্তু তোমার সুমধুর আওয়াজ তো আমার কর্ণকুটিরে এসেই যায়।"

হুযূর (সঃ)কে স্বপ্নে দেখার আকাংখা

এমনিভাবে প্রত্যক্ষভাবে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার আকাংখা থাকা। মৃত্যুর পর তো দেখা হওয়ার আকাংখা থাকবেই বরং দুনিয়াতেও যেন স্বপ্নযোগে তাঁর যিয়ারত নসীব হয়ে যায়।

হযরত আবু মূসা (রাযিঃ)-এর যিয়ারতের শওক

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) তাঁর এক সঙ্গীসহ যখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেয়ারতের জন্য ইয়ামান বা হাবশা হতে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হন তখন মনের আবেগে পথে পথেই গুণগুণিয়ে বলতে থাকতেন—

غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَّةَ * مُحَمَّدًا وَصَحْبَه

"(আহ্ কি মজা!) কাল প্রিয়তম রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সাথে সাক্ষাৎ হবে।"

কবির ভাষায়—

سر بوقت ذبح اپنا ان کے زیر پائے ہے
یہ نصیب الله اکبر لوٹنے کی جائے ہے

"আমার খণ্ডিত মস্তক তোমারই পদতলে ভূলণ্ঠিত হবে। আল্লাহু আকবার! কি পরম সৌভাগ্য আমার!"

نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے
یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے

"তোমারই পদতলে বেরিয়ে যাক আমার শেষ নিঃশ্বাস। এটাই আমার অন্তরের কামনা, এটাই আমার পরম বাসনা।"

হযরত বেলাল (রাযিঃ)-এর মৃত্যুকালীন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের আকাংখার কথা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এমনিভাবে হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রাযিঃ)-এর মহব্বত ও ভালবাসার বিষয়টিও উল্লেখিত হয়েছে।

জনৈক কবি বলেছেন—

وہ دن خدا کرے کہ مدینہ کو جائیں ہم
خاک در رسول کا سرمہ لگائیں ہم

"আল্লাহ সেদিন করুন, যেদিন আমরা মদীনা যাব। প্রিয় নবীজীর পদস্পর্শে ধন্য ধূলিকণার সুরমা লাগাব।"

জনৈক কবি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তার হৃদয়ে উদ্বেলিত ভালবাসার অবস্থাটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন—

چو رسی بکوئے دلبر بسپار جان مضطر
کہ مباد بار دیگر نرسی بدین تمنا

"তুমি যখন প্রিয়তমের অলিন্দে প্রবেশ করবে তখন তোমার আত্মাটাকে বিলীন করে দাও। কেননা, হতে পারে পুনরায় তুমি এই কাংখিত স্থানে পৌছতে নাও পার।"

হুযূর (সঃ)এর পরিবার-পরিজনের প্রতি মহব্বত

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি মহব্বত রাখা। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রাযিঃ) সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

اَللّٰهُمَّ اَحِبَّهُمَا فَاِنِّیْ اُحِبُّهُمَا ۔

"আয় আল্লাহ! আপনি হাসান ও হুসাইনকে মহব্বত করুন, আমি এদেরকে মহব্বত করি।" (বুখারী শরীফ, পৃঃ ৫২৯)

অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে—

مَنْ اَحَبَّهُمَا فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ فَقَدْ اَحَبَّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَنْ اَبْغَضَهُمَا فَقَدْ اَبْغَضَنِىْ وَمَنْ اَبْغَضَنِىْ فَقَدْ اَبْغَضَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَفِىْ رِوَايَةٍ وَمَنْ اَبْغَضَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَقَدْ كَفَرَ بِاللّٰهِ

"যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনকে মহব্বত করল, সে আমাকে মহব্বত করল। যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করল নিঃসন্দেহে সে আল্লাহকে মহব্বত করল। আর যে ব্যক্তি হাসান ও হুসাইনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, আর যে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল সে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, যে আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আল্লাহকে অস্বীকার করল।"

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান (রাযিঃ) সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُحِبُّهٗ فَاَحِبَّ مَنْ يُّحِبُّهٗ

"আয় আল্লাহ! আমি হাসানকে ভালবাসী। সুতরাং যে ব্যক্তি হাসানকে ভালবাসবে, তাকে আপনি ভালবাসুন।"

হযরত ফাতেমা যাহরা (রাযিঃ) সম্পর্কে ইরশাদ করেন—

اِنَّهَا بَضْعَةٌ مِّنِّىْ فَمَنْ اَغْضَبَهَا فَقَدْ اَغْضَبَنِىْ

"নিঃসন্দেহে ফাতেমা আমার দেহের টুকরা। যে ব্যক্তি তাঁকে নারাজ ও অসন্তুষ্ট করল, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করল।" (বুখারী শরীফ, পৃঃ ৫৩২)

উপরোক্ত হাদীসগুলোর দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি মহব্বত রাখাও আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত রাখার আলামত ও নিদর্শন।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সাহাবায়ে কেরামের প্রতি মহব্বত রাখাও তাঁর প্রতি মহব্বত রাখার নিদর্শন। পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে—

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ لَاتَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِّنْ بَعْدِىْ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ وَمَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ

"আমার সাহাবীদের সম্পর্কে তোমরা অতি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করবে। আমার পর তাদেরকে (কটুক্তি ও সমালোচনার) লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নিওনা। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখবে সে আমার প্রতি মহব্বতের কারণেই তাদের প্রতি মহব্বত রাখবে। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে। আর যে ব্যক্তি তাদেরকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল। যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে কষ্ট দিল, অতি শীঘ্রই আল্লাহ তাকে ধ্বংস করে দিবেন।" (আয় আল্লাহ! আমরা এই অবস্থা হতে আপনার আশ্রয় চাই।)

হাদীসের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা ও মহব্বত পোষণ করা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করার নিদর্শন ও প্রতীক। যে সকল ব্যক্তি মুক্ত চিন্তা ও তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের মুখরোচক শ্লোগানের অন্তরালে সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করাকে নিজেদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং বক্তৃতা ও লেখনীতে সাহাবায়ে কেরামের দোষ চর্চা করাকে অনুশীলন ক্ষেত্র বানিয়ে নিয়েছেন এবং এটাকেই তাদের যোগ্যতা প্রকাশের মানদণ্ডরূপে মনে করে বসেছেন তাদের একটু গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত এবং নিজের পরিণতির কথা ভেবে দেখা দরকার।

হুযূর (সঃ)এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি মহব্বত

যাদের সাথে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ও সম্পর্ক ছিল তাদের সকলের সাথে মহব্বত ও সম্পর্ক রাখাও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত রাখার আলামত ও নিদর্শন। হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পালিত পুত্র যায়েদ ইবনে হারেসার ছেলে হযরত উসামা (রাযিঃ) সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ)কে বলেছিলেন—

اَحِبُّوْهُ فَاِنِّىْ اُحِبُّهُ

"উসামাকে মহব্বত করবে। কেননা, আমি তাকে মহব্বত করি।" (জমউল ফাওয়ায়েদ, খণ্ড ২, পৃঃ ২১৯)

হযরত উমর (রাযিঃ) কর্তৃক উসামাকে পুত্রের উপর প্রাধান্য দেওয়া

খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) তাঁর খেলাফতকালে সাহাবায়ে কেরামদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি তাঁর ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ)–এর ভাতা নির্ধারণ করেন তিন হাজার এবং হযরত উসামা ইবনে যায়েদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করেন সাড়ে তিন হাজার। এতে খলীফা পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) খলীফার নিকট আরয করলেন যে, আপনি কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে উসামা (রাযিঃ)কে আমার উপর প্রাধান্য দিলেন এবং আমার চেয়ে বেশী ভাতা নির্ধারণ করলেন? (অথচ ইসলামের জন্য তাঁর ত্যাগ ও অবদান আমার চেয়ে অধিক নয়।) পুত্রের প্রশ্নের জবাবে হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উসামার পিতা তোমার পিতা অপেক্ষা এবং উসামা তুমি অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন। সুতরাং আমি আমার প্রিয়পাত্রের উপর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্রকে প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়েছি।

আনসারদের প্রতি মহব্বত

অনুরূপভাবে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে বলেছিলেন—

اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ

"আনসারদের প্রতি মহব্বত ঈমানের আলামত এবং আনসারদের প্রতি দুশমনী ও বিদ্বেষ, মুনাফেকীর আলামত।" (বুখারী শরীফ, পৃঃ ৭)

আরবদের প্রতি মহব্বত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ اَحَبَّ الْعَرَبَ فَبِحُبِّىْ اَحَبَّهُمْ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ

"যে ব্যক্তি আরবদের প্রতি মহব্বত রাখে, সে মূলতঃ আমার জন্যই তাদেরকে মহব্বত করে। আর যে ব্যক্তি আরবদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে প্রকৃতপক্ষে আমার কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।"

উল্লেখিত হাদীসগুলোর দ্বারা বুঝা গেল যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার দাবী হল এই যে, তিনি যাদেরকে মহব্বত করতেন তাদের সকলের প্রতিই মহব্বত ও ভালবাসা রাখা কর্তব্য। প্রবাদ আছে—

حَبِيْبُ الْحَبِيْبِ حَبِيْبٌ

"বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু হয়ে থাকে।"

হযরত সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও উম্মতের বড় বড় মহান ব্যক্তিগণের অবস্থাও ছিল এই যে, তাঁরা সর্বাবস্থায়ই রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দকে সম্মুখে রাখতেন এবং তাঁর পছন্দকেই অগ্রাধিকার দিতেন। এমনকি তাঁরা নিজেদের স্বভাবকে পর্যন্ত (যা বদলানো অত্যন্ত কঠিন) পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ ও আকাংখার অনুগত করে দিয়েছিলেন।

হযরত আনাসের কদুর প্রতি মহব্বত

হযরত আনাস (রাযিঃ) একটি দাওয়াতের অনুষ্ঠানে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেছে বেছে কদুর টুকরাগুলো অতি আগ্রহ সহকারে আহার করছেন। এটা দেখার পর হযরত আনাস (রাযিঃ)–এর অবস্থা এরূপ হয়ে গেল যে, তিনি নিজে বর্ণনা করেন—

فَمَا زِلْتُ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذٍ

"অতঃপর সেদিনের পর থেকে আমিও কদু খাওয়া পছন্দ করে ফেলি।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে—

مَاصُنِعَ لِىْ طَعَامٌ وَيُوْجَدُ الدُّبَّاءُ اِلَّا وَقَدْ جُعِلَ فِيْهِ

"সেদিনের পর থেকে আমার জন্য এমন কোন খানা তৈরী করা হয় নাই যে, কদু সংগ্রহ করা সম্ভব অথচ আমার খানায় কদু দেওয়া হয় নাই।"

হুযূর (সঃ)-এর প্রিয় খাদ্য

একদা হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মজলিসে আলোচনা চলছিল যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কদু অত্যন্ত প্রিয় ও পছন্দনীয় ছিল। এই সময় একব্যক্তি বলে উঠল, আমার তো লাউ একেবারেই পছন্দ হয় না! লোকটির এই কথা শুনে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) তলোয়ার হাতে নিয়ে বললেন, "অতি শীঘ্র কালেমা পড়ে ঈমান দোহরিয়ে লও, নতুবা আমি এক্ষুণি তোমাকে কতল করে ফেলব"। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এইজন্য কঠোর পন্থা গ্রহণ করলেন যে, বাহ্যতঃ লোকটির এই উক্তি পবিত্র হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল।

একদা হযরত হাসান ইবনে আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) এই তিনজন মিলে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেমা ও দাসী হযরত সালমা (রাযিঃ)-এর নিকট গিয়ে অনুরোধ করলেন—

اَنْ تَصْنَعَ لَهُمْ طَعَامًا مِمَّاكَانَ يُعْجِبُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"তিনি যেন তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যে খাবার অধিক প্রিয় ছিল সেরূপ খাবার তৈরী করে দেন।"

হযরত সালমা (রাযিঃ) বললেন, বেটারা! আজ আর তোমরা সেরূপ খানা পছন্দ করবে না। কিন্তু তাঁরা হযরত সালমার কথা মানলেন না। বরং বারবার সেই একই অনুরোধ করতে থাকেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই প্রিয় খানা তাদের তৈরী করে দিতেই হবে। সুতরাং হযরত সালমা (রাযিঃ) উঠে গিয়ে কিছু গম পিষেণ এবং এগুলোকে একটি পাতিলে রেখে এগুলোর উপর সামান্য যায়তুনের তৈল, অল্প মরিচ ও কিছু মসলা গুড়ো করে দিয়ে

তা রান্না করে এনে তাদের সম্মুখে রেখে দিয়ে বলেন, এটাই সেই খানা যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)এর মহব্বত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাবাগত করা চামড়ার জুতা পরতে দেখেছেন। অতঃপর সর্বদাই তিনি এরূপ জুতাই ব্যবহার করেছেন। তিনি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দাঁড়ি মুবারকে মেহদীর রং দিতে দেখেছেন, তাই তিনিও আমৃত্যু দাঁড়িতে মেহদীর রং ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যারা বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে, তাদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা, এটাও মহব্বতের একটি অপরিহার্য দাবী।

সুন্নতের বিরোধিতাকারীদের থেকে দূরে থাকা

যে ব্যক্তি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের বিরোধিতা করবে এবং দ্বীনের মধ্যে ভিত্তিহীন নতুন নতুন কথা ও বিদআত আবিষ্কার করবে, তাদের থেকে দূরে থাকা। তবে তাদেরকে নসীহত ও উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট গমন করা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

সুন্নতের বিরোধিতা দেখে ঘৃণা পোষণ করা

যে কোন বিষয় (কথা কাজ ও অবস্থা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তের বিরোধী হবে এগুলোর প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে। এগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া ও মূলোৎপাটন করার জন্য অপরিহার্য কর্তব্যরূপে সর্বাত্মক সচেষ্ট থাকবে। যদি হাতের দ্বারা মিটানোর শক্তি থাকে তাহলে হাতের দ্বারা মিটাবে। যদি সেরূপ শক্তি না থাকে তাহলে কথার মাধ্যমে তাকে নসীহত করবে। যদি এই শক্তিও না থাকে তাহলে অন্ততঃ মনে মনে ঘৃণা পোষণ করবে এবং সেখান থেকে দূরে সরে যাবে এবং এগুলো মিটিয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের চৌদ্দ, পনের ও ষোল এই তিনটি আলামত ও নিদর্শনই নিম্নোক্ত পবিত্র আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে—

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْا اٰبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط

"যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি (পরিপূর্ণ) ঈমান রাখে তাদেরকে আপনি কখনো এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব রাখতে দেখবেন না যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে। সেসব লোক তাদের পিতা, পুত্র, ভাই বা আত্মীয়ই হোক না কেন।" (হাশর ঃ ২২)

হুযূর (সঃ)এর প্রতি শত্রুতার কারণে আপন সন্তানদের হত্যা করা

সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে যাদের পিতা, পুত্র আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমন ছিল, বিভিন্নভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শত্রুতা করত, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে খুশী করার উদ্দেশ্যে তারা নিজেরাই উহুদের যুদ্ধে তাদেরকে স্বহস্তে হত্যা করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, উপরোল্লিখিত আয়াতে সাহাবায়ে কেরামদের একটি বিশেষ জামাআতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন পিতার দ্বারা হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা উহুদের যুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন তার পিতাকে তিনি নিজ হাতে কতল করেছিলেন। পুত্র সম্পর্কে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, বদরের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তাঁর পুত্র আবদুর রহমানকে মোকাবেলা করতে ডেকেছিলেন। অবশ্য রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধ করার পর তিনি বিরত থাকেন। ভাইয়ের দ্বারা হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, উহুদের যুদ্ধে তিনি তাঁর ভাইকে হত্যা করেছিলেন। আর 'আত্মীয়-স্বজন' দ্বারা হযরত আলী (রাযিঃ) ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দুশমন হওয়ার কারণে নিজেদের বংশ ও আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করেছিলেন।

আল্লামা দুলজী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর (রাযিঃ) বদরের যুদ্ধে তাঁর মামা আস ইবনে হিশামকে হত্যা করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্রকারী ও মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এক যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পথে বলেছিল—

لَئِنْ رَّجَعْنَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ط

"আমরা মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর সম্মানিত ব্যক্তিরা সেখান থেকে নিকৃষ্ট ও অপমানিত ব্যক্তিদের অবশ্যই বের করে দিবে।" (মুনাফেকুন ঃ ৮)

আল্লাহর এই দুশমন এই কথার দ্বারা নিজে নিজেকে সম্মানিত ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিকৃষ্ট বলেছিল। এই চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করেই সে ক্ষান্ত থাকে নাই, বরং সে আরো বলেছিল—

لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ط

"রাসূলুল্লাহ'র নিকট যারা একত্রিত হয়েছে এদেরকে তোমরা ভরণ-পোষণ ও সহযোগিতা করো না। এভাবে এরা নিজেরাই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে।" (মুনাফেকুন ঃ ৭)

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর এই চরম ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি ও বেআদবীপূর্ণ কথার দ্বারা তার কুফর ও নিফাক এবং ইসলামের বিরোধিতায় তার দুশমনীর স্বরূপ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়ে পড়েছিল। তাই সাহাবায়ে কেরাম তাকে হত্যা করার সংকল্প করেন এবং এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি চান। কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার অনুমতি দেন নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযিঃ) একজন সাচ্চা নিষ্ঠাবান মুখলিস ঈমানদার ছিলেন। তিনি যখন লোকমুখে শুনতে পেলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তখন তিনি নিজে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে আরয করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জানতে পেরেছি, আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর যেসব বেআদবীসুলভ ও ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি ও চক্রান্তের সংবাদ আপনার নিকট পৌঁছেছে, সেই ভিত্তিতে আপনি তাকে কতল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদি হুযূরের সিদ্ধান্ত এই হয়ে থাকে তাহলে আমাকে হুকুম করুন। আমিই তার মস্তক কেটে এনে হযরতের খেদমতে পেশ করি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমার কবীলার লোকেরা জানে যে, আমার ন্যায় পিতৃভক্ত পুত্র দ্বিতীয় জন নাই। তাই আমার আশংকা হয়

যে, হুযূর যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে এই হত্যার হুকুম দেন এবং তিনি তাকে হত্যা করেন আর পিতার হত্যাকারীকে রাস্তা-ঘাটে চলতে ফিরতে দেখে আমার মধ্যে যদি পিতৃহত্যার প্রতিশোধের ক্রোধ ও জেদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং আমি তাকে হত্যা করে ফেলি, এমতাবস্থায় একজন কাফেরের বদলায় একজন মুমিনকে হত্যা করার কারণে আমি চির জাহান্নামী হয়ে যাব। তাই হুযূরের খেদমতে আমার অনুরোধ, এমনটি যাতে না হয় সেজন্য হুযূরের যদি তাকে হত্যা করারই সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে আমাকেই হুকুম করুন, আমিই তার কর্তিত মস্তক এনে হুযূরের সম্মুখে পেশ করি।

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জওয়াব দিলেন—

بَلْ نَرْفِقُ بِهٖ وَنُحْسِنُ صُحْبَتَهٗ

"(না, তাকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা আমাদের নাই।) বরং আমরা তো তার সাথে বিনম্র ব্যবহার ও উত্তম আচরণই করব।"

কুরআনের প্রতি মহব্বত

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের আরেকটি আলামত হল এই যে, কুরআনে করীমের প্রতি মহব্বত হবে। এই পবিত্র কুরআন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে। এর দ্বারা মানুষ হেদায়াত লাভ করেছে। স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর আমল করেছেন এবং কুরআনের মত করেই তিনি তাঁর চরিত্র মাধুর্য গড়ে তুলেছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাযিঃ) বলেন—

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنَ

"রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চরিত্র মাধুর্য ছিল কুরআনেরই বাস্তব নমুনা।"

পবিত্র কুরআনের প্রতি মহব্বতের আলামত হল, বেশী বেশী করে কুরআন পাকের তেলাওয়াত করা। এর অর্থ বুঝার চেষ্টা করা। নিজে যিন্দিগীর প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনের উপর আমল করা। অন্যকে কুরআন শরীফ পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। যে সকল প্রতিষ্ঠানে কুরআনের শিক্ষা দেওয়া হয় সেগুলোর সাহায্য-সহযোগিতা করা। নিজের মহল্লা ও এলাকায় কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকলে সেখানে কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা।

হযরত সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তসতরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে—

عَلَامَةُ حُبِّ اللّٰهِ حُبُّ الْقُرْاٰنِ وَعَلَامَةُ حُبِّ الْقُرْاٰنِ حُبُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَامَةُ حُبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّ السُّنَّةِ وَعَلَامَةُ حُبِّ السُّنَّةِ حُبُّ الْاٰخِرَة وَعَلَامَةُ حُبِّ الْاٰخِرَةِ بُغْضُ الدُّنْيَا وَعَلَامَةُ بُغْضِ الدُّنْيَا اَنْ لَّا يَدَّخِرَ مِنْهَا اِلَّا زَادًا وَّبُلْغَةً اِلَى الْاٰخِرَةِ

"আল্লাহ তাআলার প্রতি মহব্বতের আলামত হল, কুরআনে পাকের প্রতি মহব্বত থাকা। কুরআনে পাকের প্রতি মহব্বতের আলামত হল, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত থাকা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত থাকার আলামত হল, সুন্নতের প্রতি মহব্বত থাকা। সুন্নতের প্রতি মহব্বতের আলামত হল, আখেরাতের প্রতি মহব্বত থাকা। আখেরাতের প্রতি মহব্বতের আলামত হল, দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণ করা। দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা পোষণের আলামত হল, সফরের যে সম্পদ ও পাথেয় আখেরাতে পৌঁছে দিবে, তাছাড়া দুনিয়ার আর কোন সহায়-সম্পদ জমা না করা।"

কেননা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ অন্বেষণ করা আফসোস ও মুসীবতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যদি হালাল ও বৈধ পন্থায় অর্জন করা হয়, তাহলেও এগুলোর হিসাব দিতে হবে। আর যদি হারাম ও অবৈধ পন্থায় অর্জন করা হয় তাহলে এর জন্য রয়েছে কঠিন আযাব ও শাস্তি। তাছাড়া দুনিয়াতে নিমগ্ন হয়ে থাকা আল্লাহকে পাওয়ার পথে খোদ একটি শক্ত অন্তরায়।

সমগ্র মুসলিম উম্মাহর প্রতি মহব্বত

সমগ্র মুসলিম উম্মার প্রতি মহব্বত থাকাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত থাকার আলামত। এই উম্মতে মুসলিমার প্রতি মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গভীর মহব্বত ও ভালবাসা ছিল। মুসলমানদের প্রতি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মহব্বতের বিষয়টি পবিত্র কুরআনেও বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ○

"(হে লোকসকল!) তোমাদের নিকট আগমন করেছেন তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন পয়গাম্বর, যার নিকট তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি দুর্বহ মনে হয়, যিনি হলেন তোমাদের অতিশয় হিতাকাংখী, মুমিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ।" (তওবা ঃ ১২৮)

বস্তুতঃ উম্মতের প্রতি এই গভীর মহব্বত, অসীম দরদ ও রহমতের কারণেই উম্মতের কেউ যদি ঈমান না আনত তাহলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত কষ্ট ও চিন্তা হত যে, এজন্য তাঁর প্রাণবায়ু বের হয়ে যাওয়ার আশংকা হত। এ বিষয়টিকেই কুরআনে পাকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ○

"(আপনি এদের জন্য এত অধিক চিন্তা করেন যে,) অতঃপর হয়ত আক্ষেপ করতে করতে আপনি এদের পেছনে আপনার জীবন বিসর্জন করে দিবেন—যদি তারা (কুরআনে বর্ণিত) এই বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান না আনে।" (কাহাফ ঃ ৬)

উম্মতের প্রতি হুযুর (সঃ)এর মহব্বত

উম্মতের প্রতি অসীম দরদ ও রহমতের কারণেই হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এত লম্বা লম্বা সেজদা করতেন যে, মনে হত যেন তাঁর পবিত্র আত্মা নির্গত হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছে। এত সুদীর্ঘ নামায পড়ে পড়ে উম্মতের হেদায়াত ও মাগফিরাতের জন্য দোআ করতেন যে, তাঁর পা মুবারক ফুলে যেত। এভাবেই রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের প্রতি ক্ষণ ও মুহূর্ত উম্মতের কল্যাণ চিন্তায় অতিবাহিত করেছেন। উম্মতের কারণেই এমন অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাস্ত করেছে যা দুনিয়ার কোন মানুষ এমনকি কোন পয়গাম্বরও বরদাস্ত করেন নাই। সুতরাং যে উম্মত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত মাহবুব ও প্রিয় ছিল তাঁর মহব্বতের খাতিরেই তাদের প্রতিও মহব্বত

ও ভালবাসা হওয়া একান্তই অপরিহার্য। কেননা, প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, বন্ধুর বন্ধুও বন্ধু হয়।

উম্মতের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার আলামত হল, যেসব বস্তু ও বিষয় দুনিয়া ও আখেরাতে উম্মতের জন্য কল্যাণকর, এগুলো অর্জন করার চেষ্টা করা। আর যেসব বস্তু ও বিষয় দুনিয়া ও আখেরাতে উম্মতের জন্য ক্ষতিকর, এগুলো প্রতিরোধ ও দূরীভূত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান।

দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা ও আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ

দুনিয়ার প্রতি বিরাগ ও ঘৃণা পোষণ এবং আখেরাতের প্রতি আকর্ষণ ও উৎসাহ থাকাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বতের একটি আলামত ও নিদর্শন। কেননা, মাহবূবে খোদা সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাতিরেই এই বিশ্বজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে। যাবতীয় নেআমত দান করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব ধনভাণ্ডারের চাবি দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর জন্য পাহাড় স্বর্ণ বানিয়ে দিতে বলা হয়েছিল। তাঁকে বাদশাহী গ্রহণ করার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু এত সব সত্ত্বেও তিনি দারিদ্রতাকেই গ্রহণ ও বরণ করে নিয়েছেন এবং আল্লাহর দরবারে তিনি সবিনয় আরয করেছেন—

لَا يَا رَبِّ وَلٰكِنِّي أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ

"হে আমার রব্ব! দুনিয়ার ধনসম্পদ ও ঐশ্বর্য আমার কাম্য নয়। আমি তো চাই একদিন তৃপ্ত হয়ে আহার করব আর একদিন ভুখা থাকব। যেদিন ভুখা থাকব সেদিন আপনার দরবারে অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটি করব। আর যেদিন পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করব সেদিন আপনার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করব।"

হুযুর (সঃ)-এর প্রতি মহব্বত ও দারিদ্র

বস্তুতঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাব-অনটন ও দারিদ্রতাকে তাঁর প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার আলামত হিসাবে চিহ্নিত

করেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দরবারে এসে এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালবাসি। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, দেখ! তুমি কি বলছ খুব ভেবে–চিন্তে বল। লোকটি আবারো বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেই একই রূপ ইরশাদ করলেন, দেখ! তুমি যা বলছ খুব ভেবে–চিন্তে বল। লোকটি আবারো বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সত্যিই আমি আপনাকে ভালবাসি। এভাবে পুনঃ পুনঃ তিনবার লোকটির একইরূপ কথা শুনে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—

اِنْ كُنْتَ تُحِبُّنِىْ فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ فَاِنَّ الْفَقْرَ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُّحِبُّنِىْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ

"যদি আমার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করে থাক তাহলে অভাব–অনটন ও দারিদ্র–পীড়ায় ধৈর্যধারণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। কেননা, আমাকে যারা ভালবাসবে ও মহব্বত করবে তাদের প্রতি অভাব ও দরিদ্রতা নিম্নমূখী ধাবমান স্রোতের চেয়েও অধিক দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসে।" (জমউল ফাওয়ায়েদ, খণ্ড ২, পৃঃ ২৭৪)

উপরোল্লিখিত আলামতগুলোর যে পরিমাণ আলামত যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার মধ্যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সেই পরিমাণ মহব্বত রয়েছে বলেই মনে করা হবে। যার মধ্যে আলামত যত কম হবে, তার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বতও সেই পরিমাণ কম হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাধারণ মহব্বত তো সকল মুমিনের অন্তরেই রয়েছে। এই মহব্বত থেকে কোন মুমিনের হৃদয়ই খালি নয়। আর যার অন্তরে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি বিন্দু পরিমাণ মহব্বতও নাই সে প্রকৃতপক্ষে মুমিনই নয়। একজন মুমিন সে যত বড় গুনাহগার ও পাপীই হোক না কেন, তার অন্তরেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কিছু না কিছু মহব্বত অবশ্যই থাকবে। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, শরাব পান করার কারণে এক ব্যক্তির উপর শরীয়তের নির্ধারিত 'হদ' (শাস্তি) কার্যকর করা হলে কেউ কেউ তার সম্পর্কে

কিছু অপ্রিয় ও অশালীন উক্তি করেছিল। তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

لَا تَلْعَنْهُ فَاِنَّهٗ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ

"(সাবধান) তার প্রতি লানত ও অভিসম্পাত করো না। নিশ্চয় সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মহব্বত করে।"

কিন্তু এই পর্যায়ের সাধারণ ও মামুলী মহব্বত যথেষ্ট নয়, এটা গুনায় লিপ্ত হওয়া থেকেও বিরত রাখতে পারে না। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ মহব্বত ও ভালবাসা থাকা জরুরী এবং পরিপূর্ণ মহব্বতই কাম্য ও উদ্দিষ্ট। এই পরিপূর্ণ মহব্বতের পরিণতি ও প্রমাণ হল রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ এত্তেবা ও অনুসরণ করা।

অতএব, উল্লেখিত আলামতগুলোকে সামনে রেখে আমাদের প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মহব্বত যাচাই করে নেওয়া উচিত যে, আমার মধ্যে কয়টি আলামত আছে আর কয়টি আলামত নাই। যে কয়টি আলামত কম আছে সেগুলো হাসিল করার এবং নিজের মধ্যে সেইগুলো পয়দা করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকা কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা সকল মুসলমানকে তাঁর ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ মহব্বত দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

ষষ্ঠ হক

রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন

রাসূল কুল সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করা উম্মতের প্রতিটি ব্যক্তির উপর ফরয।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ○ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ الآية

"(হে মুহাম্মদ!) আপনাকে আমি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারী হিসাবে পাঠিয়েছি। যেন তোমরা আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তাঁকে সাহায্য কর এবং তাঁকে সম্মান কর।"

'তাঁকে সাহায্য কর এবং তাঁকে সম্মান কর'-এর সর্বনামদ্বয় 'আল্লাহ' শব্দের পরিবর্তেও আনা যেতে পারে, 'রাসূল' শব্দের পরিবর্তেও আনা যেতে পারে।

অপর উক্তি অনুযায়ী উক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, আয়াতের অর্থ "তোমরা তাঁকে সম্মান কর।"

আর মুবাররাদ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, "তোমরা তাঁকে অতি সম্মান কর।"

ফলকথা, অপর উক্তি অনুসারে আয়াতে কারীমায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে।

আরো বহু আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে। যেমন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○

"হে ঈমানদাররা! তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের (অনুমতির) আগে কোন কথা বা কাজ করো না। (অর্থাৎ যতক্ষণ সুস্পষ্টভাবে অথবা নির্ভরযোগ্য আলামতের মাধ্যমে কথা বলার অনুমতি না পাওয়া যায় ততক্ষণ কথা বলো না।) আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"

উপরোক্ত আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডিঙিয়ে কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এটা তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), ইমাম ছা'লাব, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে ইয়াযীদ শায়বানী, সাহ্ল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী প্রমুখ হতে এটাই বর্ণিত রয়েছে।

হযরত হাসান বসরী, মুজাহিদ, যাহ্হাক, সুদ্দী, সুফিয়ান ছাউরী প্রমুখের উক্তির সারমর্ম হল, সাহাবায়ে কেরামকে দ্বীনি বা দুনিয়াবী যে কোন কাজে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ বা অনুমতি প্রদানের পূর্বে কোন ফয়সালা দিতে বা অভিমত ব্যক্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

আর "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর" এ কথাটি বৃদ্ধি করতঃ আল্লাহ তাআলা উক্ত নির্দেশকে আরো দৃঢ় করেছেন। তাই আল্লামা মাওয়ারদী (রহঃ) এর অর্থ বর্ণনা করেছেন—"কোন কাজে বা কথায় রাসূলুল্লাহ থেকে আগে বেড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।"

আবু আবদুর রহমান (রহঃ) এর অর্থ এভাবে বর্ণনা করেছেন—

اتَّقُوهُ فِي إِهْمَالِ حَقِّهِ وَتَضْيِيعِ حُرْمَتِهِ

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হক প্রদান না করার ব্যাপারে এবং তাঁর মর্যাদা বিনষ্ট করার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর।

অতএব উক্ত আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জোরাল নির্দেশ প্রমাণিত হল।

অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ○

"হে ঈমানদাররা! তোমরা পয়গাম্বরের আওয়াজের উপর নিজেদের আওয়াজ উচ্চ করো না এবং তাঁর সাথে তোমরা পরস্পরে যেভাবে উচ্চস্বরে কথা বল

সেভাবে উচ্চস্বরে কথা বলো না। হতে পারে (এর দরুন) তোমাদের আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে আর তোমরা তা অনুভবও করতে পারবে না।”

হযরত আবু বকর ও উমর (রাযিঃ)-এর শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন

বনু তামীম গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসল। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) কা'কা' বিন সাঈদকে আমীর করার প্রস্তাব পেশ করেন আর হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) আকরা বিন হারেসকে আমীর করার প্রস্তাব পেশ করেন। এ ব্যাপারে বাদানুবাদের এক পর্যায়ে উভয়ের আওয়াজ উচ্চ হয়ে যায়। আর তাঁদের কথা-বার্তায়ও উত্তপ্ত ভাব এসে যায়। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে উপস্থিত ছিলেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত নাযিল হয়।

এরপর উভয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলার দরুন অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হলেন। হযরত আবু বকর (রাযিঃ) বললেন—

وَاللّٰهِ لَا اُكَلِّمُكَ بَعْدَ هٰذَا اِلَّا كَاَخِي السِّرَارِ

“খোদার কসম! আমি আপনার সাথে ভবিষ্যতে গোপন সংলাপকারীর ন্যায় কথা বলব।”

আর হযরত উমর (রাযিঃ) উচ্চভাষী হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এত ক্ষীণ আওয়াজে কথা বলতেন যে, কোন কোন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন—হে উমর, তুমি কি বললে?

ছাবেত ইবনে কায়েসের ঘটনা

হযরত ছাবেত বিন কায়েস (রাযিঃ)–এর কানে কিছুটা বধিরতা ছিল যার ফলে তাঁর আওয়াজ স্বাভাবিকভাবে উচ্চ হয়ে যেত। উক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং আশংকা বোধ করলেন যে, না জানি কখন আমার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। এ দুঃখ ও আশংকায় তিনি ঘরে বসে রইলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে অংশ গ্রহণ বাদ দিয়ে দিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ অবস্থা সম্বন্ধে

জানতে পেয়ে তাঁকে ডাকালেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন—

يَا نَبِيَّ اللّٰهِ لَقَدْ خَشِيْتُ اَنْ اَكُوْنَ هَلَكْتُ نَهَانَا اللّٰهُ اَنْ نَّجْهَرَ بِالْقَوْلِ وَاَنَا امْرُءٌ جَهِيْرُ الصَّوْتِ

“হে আল্লাহর নবী! আমি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা করছি। কারণ আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আপনার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন আর আমি হলাম উচ্চভাষী।”

আল্লাহ তাআলা তাঁর এ শিষ্টাচার এত পছন্দ করেছেন যে, কুরআনে কারীমে তাঁর প্রশংসা করেছেন এবং মাগফেরাত ও বিরাট প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইরশাদ হয়েছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ؕ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

“নিশ্চয় যারা আপন আওয়াজকে রাসূলুল্লাহর সামনে নীচ করে তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাদের জন্য মাগফেরাত ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।”

সম্মান প্রদর্শনকারীদের জন্য তিনটি পুরস্কার

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা এ সব লোকের জন্য তিনটি বিষয়ের সুসংবাদ দান করেছেন। (১) তাকওয়া (২) মাগফেরাত (৩) বিরাট প্রতিদান। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, আল্লাহ তাআলা এ তিনটি শব্দে ইহলৌকিক, পারলৌকিক, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অগণিত নেয়ামত, রহমত ও বরকতের ওয়াদা করেছেন। কেননা, কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে মুত্তাকীদের জন্য ইহলৌকিক পারলৌকিক, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য অসংখ্য নেয়ামতের ওয়াদা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে মাগফেরাত আল্লাহ তাআলার একটি বিরাট বড় নেয়ামত। কারণ পরকালের সমস্ত নেয়ামত এর উপরই নির্ভর করে। এসব নেয়ামতের পর মহান আল্লাহ বিরাট প্রতিদানের ঘোষণা করেছেন। অতএব সে বিরাট প্রতিদান কত যে মহান

হবে তা কল্পনাই করা যায় না।

এর পূর্ববর্তী আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলা এবং উচ্চস্বরে আহ্বান করার ব্যাপারে আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও সম্মান রক্ষা করার মধ্যে দু জাহানের নেয়ামত আর তাঁর সাথে বেআদবী করার মধ্যে দু জাহানের ক্ষতি এবং ধ্বংস নিহিত রয়েছে। অধিকন্তু যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও সম্মান রক্ষা করে না তাদেরকে আল্লাহ তাআলা নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَّرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ○

"নিশ্চয় যারা আপনাকে হুজরাসমূহের বাহির থেকে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।"

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ উৎঘাটিত হয়—

(১) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এত উচ্চস্বরে কথা বলা যার ফলে নিজের আওয়াজ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজের সমতুল্য হয়ে যায় এটা জায়েয নয়। (সুতরাং তাঁর আওয়াজের চেয়ে উচ্চ হয়ে গেলেও তা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।)

(২) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পরস্পর উচ্চস্বরে কথা বলা জায়েয নয়।

(৩) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এমন বেপরোয়াভাবে কথাবার্তা বলা যেভাবে পরস্পর বলা হয় জায়েয নয়।

(৪) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে নাম নিয়ে ডাকা যেভাবে পরস্পর ডাকা হয় জায়েয নয়।

(৫) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে অবস্থান করছেন এমতাবস্থায় বাহির থেকে ডেকে বের করা জায়েয নয়।

রওযা পাকের যিয়ারতের সময় কতিপয় আদব

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওজা মোবারকে জীবিত আছেন তাই জীবদ্দশায় তাঁকে যেমন আদব ও সম্মান প্রদর্শন করা হত এখনও তা রক্ষা করতে হবে। অতএব রাওজা মোবারকে হাজির হওয়ার সময় নিম্ন

লিখিত বিষয়সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে—

(১) সালাত ও সালাম উচ্চস্বরে পড়বে না।

(২) দৃষ্টি নীচের দিকে রাখবে। ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে পায়ের দিকে দাঁড়ান।

(৩) সালাত ও সালাম পেশ করার সময় এমন শব্দ প্রয়োগ করবে যদ্দ্বারা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ মহত্ব ও মর্যাদা প্রকাশ পায়। যেমন এভাবে বলবে—

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ * اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ * اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَخَلْقِ اللّٰهِ
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَالْمُرْسَلِيْنَ * اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

শুধু নাম নেওয়ার উপর যথেষ্ট বোধ করবে না। যেমন কেউ বলল—"আস্সালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মদ।"

(৪) সালাত ও সালাম পেশ করা কালে রাওজা মোবারকের জাল স্পর্শ করবে না।

(৫) পূর্ণ মনোযোগের সাথে সালাত ও সালাম পেশ করবে। এদিক ওদিক ধ্যান করবে না। দুজাহানের সরদার মাহবূবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গাফেল ও অমনোযোগী অন্তর নিয়ে হাজির হওয়া অত্যন্ত বড় বেআদবী। তাই উত্তম নিয়ম হল, রাওজায়ে আকদাসে হাজির হওয়ার আগে গোসল করে পাক পবিত্র কাপড় পরে, খুশবো ব্যবহার করে মসজিদে নববীতে গিয়ে দুরাকাত নফল নামায পড়বে। নামাযান্তে আল্লাহর কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব ও সম্মান রক্ষা করার তৌফিক কামনা করবে। বিগত গোনাহসমূহ হতে খাঁটি তৌবা করবে। আল্লাহর দরবারে মাগফেরাতের দরখাস্ত করবে। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের মহত্ত্বের বিষয় চিন্তা করবে এবং তা অন্তরে উপস্থিত করবে। অতঃপর দৃষ্টি নীচ করে অত্যন্ত আদব ও ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে রাওজা মোবারকে হাজির হয়ে প্রথমতঃ সংক্ষিপ্ত সালাত ও সালাম পেশ করবে। তারপর সিদ্দীকে আকবর ও উমর ফারুক (রাযিঃ)কেও সালাম নিবেদন করবে। এরপর ফিরে আসবে। দীর্ঘ কবিতা পাঠ করবে না। কারণ দীর্ঘক্ষণ মনের একাগ্রতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। হাঁ, বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যারা মনের একাগ্রতা বজায়

রাখতে সক্ষম তাদের জন্য দীর্ঘ কবিতা পাঠে কোন অসুবিধা নাই। যেসব কবিতায় বাস্তবতা কম সেগুলো থেকে বিরত থাকা চাই। কারণ সেই পবিত্র দরবারে কৃত্রিমতা ও কপটতা নিয়ে যাওয়া বিরাট ক্ষতির কারণ।

(৬) বারবার শিয়রের দিক দিয়ে আনাগোনা করবে না। সেখানে কেবল সালাত ও সালাম পেশ করার জন্য যাবে। সর্বোত্তম পন্থা হল এই যে, বাবে জিব্রাঈল দিয়ে প্রবেশ করবে অতঃপর সালাত ও সালাম নিবেদন করে ঐদিক দিয়েই বের হয়ে আসবে। হাঁ যদি কোন বিশেষ অসুবিধা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা।

(৭) রাওজা মোবারকের নিকটে পরস্পর কথাবার্তা বলা জঘন্য অপরাধ। এমনকি মসজিদে নববীতেও প্রয়োজন ব্যতিরেকে কারো সাথে কথা বলবে না। প্রয়োজন হলে আস্তে বলবে এবং প্রয়োজন পরিমাণই কথা বলবে।

(৮) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এমন শব্দ কখনও প্রয়োগ করবেনা যাতে তাঁর মর্যাদার পরিপন্থী বিষয়ের লেশমাত্র রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا

"হে ঈমানদাররা! তোমরা 'রায়িনা' শব্দ বলো না 'উন্‌যুরনা' শব্দ বলো। আয়াতে কারীমায় মুমেনদিগকে রায়িনা শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। আরবী ভাষা অনুসারে এর অর্থ হচ্ছে, আপনি আমাদের রেয়াত করুন, আমাদের প্রতি লক্ষ্য করুন। কিন্তু ইহুদীদের ভাষা অনুসারে এর ভিন্ন অর্থ রয়েছে যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার পরিপন্থী।

এমনিভাবে আরবী ব্যাকরণ অনুসারে রায়িনা অর্থ আপনি আমাদের রেয়াত করুন আমরা আপনার রেয়াত করব। এর দ্বারা আরেকটি বিপরীত অর্থ বুঝে আসে। সেটি হল, আপনি যদি আমাদের রেয়াত না করেন তাহলে আমরাও আপনার রেয়াত করব না। সাহাবায়ে কেরাম অবশ্য প্রথম অর্থ গ্রহণ করতেন কিন্তু তথাপি এতে দ্বিতীয় অর্থের ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে বিধায় উক্ত শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার পরিপন্থী।

অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হল যে, যে শব্দে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার পরিপন্থী বিষয়ের লেশমাত্র সম্ভাবনাও রয়েছে তাও তাঁর শানে ব্যবহার করার অনুমতি নাই।

আজকাল সাধারণতঃ নাত ও কাসীদা (কবিতা) পাঠ করা হয়; এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকা উচিত।

সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে নবী করীম (সঃ)-এর মহত্ত্ব

হযরত আমর ইবনে আস (রাযিঃ)-এর ঘটনা

হযরত আমর ইবনুল আস (রাযিঃ) নিজের এক ঘটনা বর্ণনা করেন—

وَمَا كَانَ اَحَدٌ اَحَبَّ اِلَيَّ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَجَلَّ فِىْ عَيْنِىْ مِنْهُ وَمَا كُنْتُ اُطِيْقُ اَنْ اَمْلَأَ عَيْنِىْ مِنْهُ اِجْلَالًا لَهُ وَلَوْ سُئِلْتُ اَنْ اَصِفَهُ مَا اَطَقْتُ لِاَنِّىْ لَمْ اَكُنْ اَمْلَأُ عَيْنِىْ مِنْهُ

আমার কাছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক প্রিয় কেউ ছিল না এবং আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে অধিক মহৎও কেউ ছিল না। এই মহত্বের দরুন কখনও আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চোখভরে দেখতে সক্ষম হতাম না। আর আমাকে যদি কেউ তাঁর অবয়ব বর্ণনা করতে বলে তাহলে আমি তা বর্ণনা করতে পারব না। কেননা আমি তাঁকে কখনও পূর্ণ চোখ মেলে দেখিইনি।

সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের একই অবস্থা ছিল। ভয় ও মহত্ত্বের দরুন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের দিকে তাকিয়ে কারো দেখার সাহস হত না।

হযরত আনাস (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের একটি চিত্র তুলে ধরছেন—

كَانَ يَخْرُجُ عَلٰى اَصْحَابِهٖ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَهُمْ جُلُوْسٌ فِيْهِمْ اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا وَلَا يَرْفَعُ اَحَدٌ مِّنْهُمْ اِلَيْهِ بَصَرَهٗ اِلَّا اَبُوْبَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا فَاِنَّهُمَا كَانَا يَنْظُرَانِ اِلَيْهِ وَيَنْظُرُ اِلَيْهِمَا وَيَتَبَسَّمَانِ اِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ اِلَيْهِمَا

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের নিকট কোন মজলিসে যেতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ)ও উপস্থিত থাকতেন। একমাত্র হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ) ছাড়া আর কেউ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাত না। তবে ইনারা উভয়ই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে তাকাতেন এবং মুচকি হাসতেন আর তিনিও তাঁদের দিকে তাকাতেন এবং মুচকি হাসতেন।

হযরত উসামা বিন শরীফ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। তাঁর সহচররা তাঁর আশেপাশে এমনভাবে বসা ছিল যেন তাদের মাথার উপর পাখী বসা আছে। (কেননা পাখী সামান্য একটু নড়া চড়া করলেই উড়ে চলে যাবে।)

হযরত উসামা বিন শরীফের অপর এক বর্ণনা—নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলতেন তখন তাঁর আশে পাশে উপবিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এমনভাবে মাথা নত করে (মনোযোগের সাথে) শুনতেন যেন তাদের মাথার উপর পাখী বসা আছে। অর্থাৎ আদবের সাথে বসে থাকতেন যে, সামান্য একটু নড়াচড়াও করতেন না।

ওরওয়াহ ইবনে মাসউদের বর্ণনা

৬ষ্ঠ হিজরীতে হোদাইবিয়ার সন্ধি উপলক্ষে কোরাইশরা ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফীকে অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠিয়েছিল। তিনি তখন যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, স্বগোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে তা এভাবে বর্ণনা করেছিলেন—

যখন মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওযু করেন তখন তাঁর ওযুর ব্যবহৃত পানি নিয়ে তাঁর সহচররা কাড়াকাড়ি শুরু করে। যেন তাদের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে যাবে। যখন তিনি থুথু ফেলেন তখন তারা সেটা হাতে নিয়ে শরীরে ও চেহারায় মাখে। তার কোন একটি চুল পড়তে মাত্রই তারা সেটা সংরক্ষণের জন্য দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। তিনি যখন কোন কাজের আদেশ করেন তখন তা পালন করার জন্য তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। যখন তিনি কথা বলেন তখন চুপ করে শ্রবণ করে। শ্রদ্ধা ও মহত্ত্বের দরুন কেউ তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখে না। ওরওয়া বিন মাসউদ প্রত্যক্ষকৃত অবস্থা কোরাইশদের কাছে বর্ণনা করার পর বলেন, আমি কেসরা (ইরান সম্রাট), কায়সার

(রোম সম্রাট) ও নাজাশী (হাবশা নৃপতি)–এর দরবারে গিয়েছি কিন্তু কাউকে তার অনুসারীদের নিকট এত শ্রদ্ধেয় দেখি নাই যতটুকু শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদকে তাঁর অনুসারীদের নিকট দেখেছি।

হযরত উসমানের (রাযিঃ) আদব

হোদাইবিয়ার সন্ধি উপলক্ষে সংলাপ করার নিমিত্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান (রাযিঃ)কে কোরাইশদের নিকট পাঠিয়েছিলেন। তারা হযরত উসমান (রাযিঃ)কে কাবাগৃহের তাওয়াফ করতে বলেছিল তখন তিনি প্রতিউত্তরে বলেছিলেন—

وَمَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ حَتّٰى يَطُوْفَ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ করতে পারি না।

সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের একই অবস্থা ছিল। তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্বের দরুন তাঁর কাছে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করার সাহস পেতেন না। তারা কোন গ্রামীণ অপরিচিত ব্যক্তির আগমনের অপেক্ষা করতেন যাতে সে এসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করে। অতঃপর তিনি যে জবাব দিবেন তা দ্বারা তাঁরাও উপকৃত হতে পারবেন।

হযরত কায়ালা (রাযিঃ)–এর ঘটনা

হযরত কায়লা বিনতে মাখরামা (রাযিঃ) তাঁর নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে ভয়ে থরথর করে কাঁপতেছিলাম।

সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এই ছিল যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ঘরের ভিতর থাকতেন আর তাঁদের কোন কঠিন প্রয়োজন দেখা দিত তখনও ভয়ে তাঁকে ডাকতে সাহস পেতেন না বরং নখ দ্বারা দরজায় ক্ষীণ আওয়াজ করতেন।

হযরত আবু ইয়ালা (রাযিঃ) বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছিলাম কিন্তু দুবৎসর যাবৎ ভয়ে এবং তাঁর মহত্ত্বের প্রভাবে জিজ্ঞাসা করার হিম্মত হয় নাই।

ওফাতের পর নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা যেমনিভাবে তাঁর জীবদ্দশায় ফরয ও অপরিহার্য ছিল তদ্রূপ এখনও তার অপরিহার্যতা অব্যাহত রয়েছে। তা হচ্ছে এভাবে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম কিংবা তাঁর সুন্নত ও জীবনচরিত সম্পর্কে আলোচনা করলে শ্রদ্ধার সাথে আলোচনা করবে। অন্য কেউ আলোচনা করলে তা শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করবে। যেন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে থেকে এসব আলোচনা করছে বা শুনছে। সলফে সালেহীন তথা পুণ্যবান পূর্বসূরীদের রীতি এটাই ছিল।

খলীফা মনসুরের প্রতি ইমাম মালেক (রহঃ)এর উপদেশ

আবু জাফর মনসূর একদা ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে কোন এক বিষয়ে কথোপকথন করছিলেন। কথাবার্তা চলাকালে একবার তিনি উচ্চস্বরে কথা বলে ফেললেন। তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, আমীরুল মুমিনীন! এ মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলবেন না। কেননা, এরজন্য আল্লাহ তাআলা এক সম্প্রদায়কে আদব শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ الاية

"হে ঈমানদাররা! তোমাদের আওয়াজ নবীর আওয়াজের চেয়ে উঁচু করো না আর তোমরা পরস্পরে যেমনিভাবে উচ্চস্বরে কথা বল তাঁর সাথে এভাবে কথা বলো না। হতে পারে এর দরুন তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে অথচ তোমরা টেরও পাবে না।"

অপর এক সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেছেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আওয়াজ নীচ করেছিল—

اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ الاية

"নিশ্চয় যারা আপন আওয়াজ রাসূলুল্লাহর আওয়াজের সামনে নীচ রাখে তারা ঐ সমস্ত লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা তাকওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এসব লোকের জন্য মাগফেরাত ও বিরাট প্রতিদান রয়েছে।"

আরেক সম্প্রদায়ের নিন্দা করেছেন যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখে নাই এবং তাঁকে সামনে আসার জন্য উচ্চস্বরে ডেকেছে—

اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ الاية

"যারা হুজরাসমূহের বাহির থেকে আপনাকে ডাকে তাদের অধিকাংশই বিবেক বুদ্ধিহীন।"

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উপদেশ শুনে খলীফা আবু জাফর মনসূর বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে নিবেদন করলেন, ওহে আবু আবদুল্লাহ! (ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উপনাম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা শরীফ যিয়ারত করার পর কেবলার দিকে মুখ করে দোআ করব নাকি তাঁর দিকে মুখ করেই দোআ করব? ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে মুখ করেই দোআ করবেন। কেননা তিনি আপনার আদি পিতা আদম (আঃ) এবং কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের সৃষ্টি হবে সবারই ওসীলা। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরেই তাঁর শাফায়াত ও ওসীলার জন্য দরখাস্ত করবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ الاية

"আর যখন তারা স্বীয় আত্মার উপর জুলুম করে বসেছিল তখন যদি তারা আপনার নিকট আসত তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূল ও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহ তাআলাকে তৌবা কবুলকারী ও দয়াশীল পেত।"

আবু আইয়ুব সাখতিওয়ানী (রহঃ)-এর মহব্বতে রাসূল (সঃ)

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট আবু আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আতবায়ে তাবেয়ীন অর্থাৎ তাবেয়ীগণের অনুসারীদের মধ্য হতে যার কথাই আমি তোমাদের কাছে বলব আবু আইয়ূব তার চেয়ে উত্তম। আবু আইয়ূব দুটি হজ্জ করেছেন। আমি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতাম কিন্তু তাঁর নিকট থেকে কোন হাদীছ গ্রহণ করতাম না। তাঁর সামনে যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হত তখন

আনন্দ ও ভালবাসার আতিশয্যে এত ক্রন্দন করতেন যে, তাঁকে দেখে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যেত। তাঁর এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করার পর থেকে আমি তাঁর নিকট থেকে হাদীস লিখতে শুরু করি।

হাদীস বর্ণনার সময় ইমাম মালেক (রহঃ)-এর অবস্থা

মুসআব বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হত তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত, কোমর ঝুঁকে পড়ত। এমনকি তাঁর এ অবস্থায় নিকটস্থ ব্যক্তিরাও মর্মাহত হত। একবার তাঁকে এ ব্যাপারে বলা হল, আপনি নিজকে এত কষ্ট দিচ্ছেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহত্ত্ব, মর্যাদা ও সৌন্দর্য আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে আমার এ অবস্থাকে তোমরা অযথা মনে করতে না।

মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির (রহঃ-এর অবস্থা

আমি কারীকুল সরদার মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদেরকে দেখেছি, আমরা যখন তাঁর নিকট কোন হাদীছ জানতে চাইতাম তখন তিনি এত কাঁদতেন যে, তাঁর প্রতি আমাদের দয়া এসে যেত। আমি মুহাম্মদকে দেখেছি, তিনি এত কৌতুকী হওয়া সত্ত্বেও যখন তাঁর সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হত তখন তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত, অবস্থার পরিবর্তন ঘটে যেত। আর আমি তাঁকে কখনও ওযু ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করতে দেখি নাই। দীর্ঘদিন যাবৎ তাঁর কাছে আমার আসা-যাওয়া ছিল। তাঁকে তিন অবস্থার যে কোন অবস্থায় অবশ্যই পেতাম। হয়ত নামাযে রত অথবা নীরব অথবা কোরআন তেলাওয়াতে রত। অন্য কোন অবস্থায় দেখা যেত না। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু এবং ইবাদতগুজার ছিলেন।

আবদুর রহমান ইবনে কাসেম (রহঃ)-এর অবস্থা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর প্রপৌত্র আবদুর রহমান বিন কাসেম যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করতেন তখন তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে যেত। মনে হত যেন তাঁর শরীর থেকে সমস্ত রক্ত বের হয়ে গেছে। তাঁর মুখ শুকিয়ে যেত। শ্রদ্ধা ও ভক্তির আতিশয্যে বক্তব্য শেষ করতে পারতেন না।

আমের ইবনে আবদুল্লাহ (রহঃ)-এর অবস্থা

আমের ইবনে আবদুল্লাহর নিকটও আমার আনাগোনা ছিল। তাঁর অবস্থা এই ছিল যে, যখন তাঁর সম্মুখে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করা হত তখন তিনি এত ক্রন্দন করতেন যে, চোখের পানি বের হতে হতে শেষ পর্যন্ত চক্ষু অশ্রুশূন্য হয়ে যেত।

মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী (রহঃ)-এর অবস্থা

আমি ইবনে শিহাব যুহরীকেও দেখেছি। তিনি অত্যন্ত নম্র মেযাজের লোক ছিলেন এবং মানুষের সাথে বেশ মেলামেশা করতেন। কিন্তু যখন তাঁর সামনে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা এসে যেত তখন তাঁর এমন অবস্থা হত যে, আপনিও তাকে চিনতে পারবেন না আর তিনিও আপনাকে চিনতে পারবেন না। যেন আত্মহারা হয়ে যেতেন।

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (রহঃ)-এর অবস্থা

আমি সাফওয়ান ইবনে সুলায়েমের খেদমতে উপস্থিত হয়েছি। তিনি ইবাদত ও সাধনায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে, একাধারে চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি শয়ন করেন নাই। তিনি যখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আলোচনা করতেন তখন এত রোদন করতেন যে, সঙ্গীরা উঠে চলে যেত আর তিনি একই অবস্থায় কাঁদতে থাকতেন।

হযরত কাতাদাহ (রহঃ)-এর অবস্থা

হযরত কাতাদাহ (রহঃ)এর কানে যখন হাদীসের আওয়াজ আসত তখন তাঁর বুকে ক্রন্দনের আওয়াজ ও শরীরে কম্পনের সৃষ্টি হয়ে যেত।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর অবস্থা

ইমাম মালেক (রহঃ)এর নিকট হাদীস শিক্ষার্থীদের সংখ্যা যখন অধিকহারে বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তারা তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, আপনি যদি এমন একজন লোক নিয়োগ করতেন,যে আপনার আওয়াজকে উচ্চস্বরে সবার কাছে পৌছিয়ে দিতে পারে তাহলে খুবই ভাল হত। তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ الاية

"হে ঈমানদাররা! তোমরা নিজের আওয়াজ পয়গাম্বর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আওয়াজের উপর উচ্চ করো না। আর তোমরা যেভাবে পরস্পরে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বল তাঁর সাথে সেভাবে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলো না। এর দরুন হয়ত তোমাদের আমল বরবাদ হয়ে যাবে অথচ তোমরা টেরও পাবে না।"

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রদ্ধা ও সম্মান জীবদ্দশায় ও ইন্তিকালোত্তর উভয় অবস্থায়ই অপরিহার্য। সুতরাং মসজিদে নববীতে উচ্চস্বরে আওয়াজ করা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরিপন্থী হবে।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর অবস্থা

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) (যাঁর মুখে মৃদু হাসি থাকত) তাঁর সামনে যখন কোন হাদীস বর্ণনা করা হত তখন হঠাৎ তাঁর অবস্থায় পরিবর্তন এসে যেত। তিনি ভীত ও নম্র হয়ে যেতেন।

আবদুর রহমান ইবনে মাহদী (রহঃ)-এর অবস্থা

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আবদুর রহমান ইবনে মাহদী যখন হাদীস পড়তেন তখন প্রথমতঃ মানুষকে চুপ হওয়ার নির্দেশ দিতেন এবং এ আয়াত তেলাওয়াত করতেন—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ الْاٰيَةَ

আর আয়াতের এই অর্থ গ্রহণ করতেন যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় কথা বললে যেমন চুপ করে তা শ্রবণ করা অপরিহার্য ছিল তদ্রূপ ওফাতের পর তাঁর পবিত্র হাদীস বর্ণনা কালেও চুপ করে শ্রবণ করা অপরিহার্য।

হাদীস বর্ণনা কালে সলফে সালেহীনের শ্রদ্ধা বজায় রাখা

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর অবস্থা

হযরত আমর ইবনে মায়মূন (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি রীতিমত এক বৎসর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়েছি। কখনও তাঁকে হাদীস বর্ণনা কালে—'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন' বলতে শুনি নাই। একবার হঠাৎ করে তাঁর মুখ থেকে—'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন' বের হয়ে গেল। অমনি তাঁর মধ্যে অস্থিরতা নেমে এল এবং কপাল ঘর্মাক্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন–

هٰكَذَا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اَوْ فَوْقَ ذَا اَوْ مَا دُوْنَ ذَا اَوْ مَا هُوَ قَرِيْبٌ مِنْ ذَا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনশাআল্লাহ এমনি বলেছেন, অথবা এর থেকে কিছু বেশী বা কম বলেছেন অথবা এর কাছাকাছি বলেছেন।"

এক বর্ণনা অনুসারে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে কালো হয়ে গিয়েছিল। অপর এক বর্ণনা অনুসারে চোখ পানিতে ভরে গিয়েছিল এবং গলার রগ ফুলে গিয়েছিল।

মদীনা মুনাওয়ারার কাযী ইব্রাহীম বিন আবদুল্লাহ আনসারী ইমাম মালেক (রহঃ) ও আবু হাতেম (রহঃ)-এর নিকট হাদীস শুনতে গেলেন। কিন্তু হাদীস না শুনেই ফিরে এলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি সেখানে এমন জায়গা পাই নাই যেখানে আদবের সাথে হাদীস শুনতে পারব। দাঁড়িয়ে হাদীস শোনা আমার কাছে সমীচীন মনে হল না।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ)-এর অবস্থা

ইমাম মালেক (রহঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ)-এর নিকট এসে কোন এক হাদীস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করল। সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব (রহঃ) শায়িত ছিলেন। অমনি উঠে পড়লেন তারপর হাদীস বর্ণনা করলেন। ঐ ব্যক্তি বলল, হুযূর! আপনি শুয়ে শুয়েই হাদীস বলুন কষ্ট করে উঠতে হবে না। তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুয়ে বর্ণনা করব এটা হতে পারে না।

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ)-এর অবস্থা

মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (রহঃ) কিছুটা কৌতুকী ছিলেন। শাগরেদ ও সহচরদের সাথে কখনও কখনও হাসি-কৌতুকও করতেন কিন্তু তাঁর সামনে যখন হাদীস বর্ণনা করা হত তখন তিনি স্তব্ধ ও নম্র হয়ে যেতেন।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর অবস্থা

আবু মুসআব আহমদ ইবনে আবু বকর বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক (রহঃ) হাদীসের সম্মানার্থে পবিত্রতা ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করতেন না।

মুতাররাফ বিন আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট যখন মানুষ আসত তখন তাঁর দাসী এসে জিজ্ঞাসা করত—শায়েখ আপনাদের কাছে জানতে চেয়েছেন, আপনারা হাদীস শুনতে এসেছেন নাকি মাসআলা জানতে এসেছেন? যদি বলত মাসআলা জানতে এসেছি তাহলে বাইরে এসে মাসআলা বলে দিতেন। আর যদি বলত হাদীস শুনতে এসেছি, তাহলে তিনি গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করে, পাগড়ি বেঁধে, খুশবো মাখিয়ে অত্যন্ত গাম্ভীর্যতা ও আদবের সাথে আসন গ্রহণপূর্বক হাদীস বর্ণনা করতেন। যতক্ষণ হাদীসের মজলিস চলতে থাকত ততক্ষণ ধূনি জ্বালিয়ে রাখা হত। আর ঐ আসনটিতে কেবল হাদীস বর্ণনা করার জন্যই বসতেন। ইবনে আবু উয়াইস বলেন, ইমাম মালেক (রহঃ)কে যখন এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হল তখন তিনি বললেন, আমার মনে চায় হাদীসের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে। তাই পবিত্রতার সাথে আদব সহকারে বসে হাদীস বর্ণনা করি।

ইবনে আবু উয়াইস আরো বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক (রহঃ) কখনও পথে-ঘাটে বা তাড়াহুড়ার সময় হাদীস বর্ণনা করতেন না। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমি চাই হাদীস খুব ভালরূপে বুঝিয়ে বর্ণনা করতে ; আর তাড়াহুড়ার অবস্থায় এটা সম্ভব হয় না।

যিরারা ইবনে মুররা বর্ণনা করেন, সমস্ত সলফে সালেহীন পবিত্রতা ব্যতীত হাদীস বর্ণনা করাকে মাকরূহ মনে করতেন।

হাদীস বর্ণনাকালে ষোলবার বিচ্ছুর দংশন

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) বর্ণনা করেন, একদা ইমাম মালেক (রহঃ) হাদীসের দরস (শিক্ষা) দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে একটি বিচ্ছু এসে তাঁকে পর পর ষোল বার দংশন করল। যখনই দংশন করত তাঁর চেহারা বিবর্ণ

হয়ে যেত। কিন্তু তিনি রীতিমত হাদীসের দরস দিতে রইলেন। দরস শেষে যখন সবাই চলে গেল তখন আমি বললাম, আবু আবদুল্লাহ! আজ আপনার এক আশ্চর্যকর অবস্থা দেখতে পেলাম। তখন তিনি বললেন, হাঁ, একটি বিচ্ছু আমাকে ষোল বার দংশন করেছে কিন্তু হাদীসে পাকের সম্মানার্থে আমি সহ্য করেছি। নড়াচড়া করি নাই।

ইবনে মাহদী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি একদা ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সঙ্গে আকীক নামক স্থানের দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে আমি তাঁর কাছে একটি হাদীস জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে ধমকি দিয়ে বললেন, আপনি পথ চলাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস জিজ্ঞাসা করবেন এটা আমি ভাবি নাই।

ইমাম মালেক (রহঃ) দাঁড়ান ছিলেন এমতাবস্থায় কাযী জারীর ইবনে আবদুল হামীদ তাঁর কাছে একটি হাদীস জানতে চাইলেন। তখন ইমাম মালেক তাকে কয়েদ করার আদেশ দিলেন। লোকেরা বলল, তিনি তো কাযী। ইমাম মালেক (রহঃ) প্রতিউত্তরে বললেন, কাযী আদব শিক্ষা পাওয়ার বেশী উপযুক্ত।

হিশাম ইবনে গাজী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট তাঁর দাঁড়ানো অবস্থায় হাদীস জিজ্ঞাসা করেছিলেন। এরজন্য ইমাম মালেক (রহঃ) তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করেছেন। এতে তিনি দয়াপরবশ হয়ে তাকে বিশটি হাদীস শিখিয়ে দেন। হিশাম বলেন, আমার আফসোস হয়, যদি তিনি আমাকে আরো বেশী বেত্রাঘাত করে আরো বেশী হাদীস শুনাতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে সালেহ বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক (রহঃ) ও লায়েছ (রহঃ) কখনও পবিত্রতা ব্যতিরেকে হাদীস বর্ণনা করতেন না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আপন হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরাপুরিভাবে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আহলে বায়েত বা পরিবারবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের মধ্যে তাঁর আহলে বায়তের সম্মানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে স্বয়ং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়তের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۝

"আল্লাহ চান হে আহলে বায়েত! তোমাদের থেকে পঙ্কিলতাকে দূরে রাখতে এবং তোমাদেরকে পাক সাফ রাখতে।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সহধর্মিণী আহলে বায়তের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে অনুরূপ উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা পবিত্র সহধর্মিণীগণের মর্যাদা বর্ণনা করে বলেছেন—

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

"আর তাঁর সহধর্মিণীগণ তাদের (মুমেনদের) মাতা।"

আয়াতে কারীমায় রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিণীগণকে মুমেনদের মাতা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং প্রকৃত মাতার সম্মান ও শ্রদ্ধা যেমন অপরিহার্য তদ্রূপ তাঁদের সম্মান এবং শ্রদ্ধাও অপরিহার্য। আর বিবাহ করা উক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার পরিপন্থী বিধায় প্রকৃত মাতার ন্যায় তাঁদেরকেও বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَا تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝

"আর এটাও জায়েয নয় যে, তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লামের) পর তাঁর স্ত্রীগণকে তোমরা কখনও বিবাহ করবে। এটা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত ভারি বিষয়।"

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

أُنْشِدُكُمُ اللَّهَ أَهْلَ بَيْتِي ثَلَاثًا

"আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বায়তের সম্মান করা এবং তাদের সাথে সদাচার করার জন্য আল্লাহর কসম দিচ্ছি।"

এ বাক্যটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার উচ্চারণ করেছেন।

আহলে বায়ত কারা?

জনৈক বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম, আহলে বায়ত কারা? তিনি বললেন, আলী (রাযিঃ)এর বংশধর, জা'ফর (রাযিঃ)-এর বংশধর, আকীল (রাযিঃ)-এর বংশধর ও আব্বাস (রাযিঃ)-এর বংশধর।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাযিঃ) হতে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابُ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ এ দুটিকে আঁকড়িয়ে ধরবে ততক্ষণ তোমরা গোমরাহ হবে না। কিতাবুল্লাহ এবং আমার আহলে বায়ত। অতএব তোমরা চিন্তা কর আমার পর তাদের (হক আদায়ের) ব্যাপারে তোমরা কিরূপ আচরণ করবে।"

এক হাদীসে আছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়তকে চিনা জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের ওসীলা। তাদেরকে ভালবাসা পুলসিরাত অতি সহজে অতিক্রম করার কারণ এবং তাদের সাহায্য করা আযাব থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায়।

আহলে বায়তকে চিনার অর্থ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের বংশগত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক কি ধরনের তা জানা। যাতে সে অনুপাতে তাদের সম্মান করা যেতে পারে।

বহু হাদীসে আহলে বায়তের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলো দ্বারা তাদের সম্মান করা জরুরী বলে প্রমাণিত হয়। উপরন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহলে বায়ত হওয়াটাই তাদের সম্মানের পাত্র হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আহলে বায়তের প্রতি উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর সম্মান

হযরত আবদুল্লাহ বিন হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি কোন এক প্রয়োজনে উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে দেখে

বললেন, আপনার কোন প্রয়োজন দেখা দিলে অন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবেন অথবা একটি কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিবেন। (আপনি নিজে কষ্ট করে আসবেন না।) কেননা আল্লাহ আপনাকে আমার দরজায় দেখবেন অথবা আমি আপনাকে আমার দরজায় দেখব এটা আল্লাহর দরবারে আমার জন্য লজ্জার বিষয়।

হযরত যায়েদ ও ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর ঘটনা

হাকেম শা'বী বর্ণনা করেন, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) আপন মাতার জানাযার নামায আদায় করলেন। নামাযান্তে তাঁর সওয়ারী আনা হল। ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) সওয়ারীর লাগাম ধরলেন। তখন যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই! আপনি লাগাম ছেড়ে দিন। তখন ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বললেন, আমাদেরকে আলেমদের এরূপ সম্মান করতেই আদেশ করা হয়েছে। যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) এটা শুনে তাঁর হাত চুম্বন করে বললেন, আমাদেরকেও আহলে বায়তের এরূপ সম্মান করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর ঘটনা

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) একদা মুহাম্মদ ইবনে উসামাকে দেখে বললেন, এ যদি আমার গোলাম হত! জনৈক ব্যক্তি বলল, এত উসামার পুত্র। এ কথা শুনে তিনি লজ্জায় মাথা নত করে দিলেন এবং অনুতপ্ত হয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলেন। আর বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতেন তাহলে অত্যন্ত ভালবাসতেন। (যেহেতু তার পিতা ও পিতামহকেও তিনি ভালবেসেছেন।)

বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির তারিখে দিমাশ্‌ক-এ লিখেন, উসামা (রাযিঃ)-এর কন্যা একদা উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাযিঃ)-এর কাছে গেলেন। বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার কারণে তাঁর গোলাম তাঁকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) তাঁকে দেখামাত্রই দাঁড়িয়ে গেলেন, তাঁকে সংবর্ধনা জানালেন এবং তাঁকে নিজের জায়গায় এনে বসালেন। নিজেও তাঁর কাছে বসলেন এবং তাঁর প্রয়োজনাদি মিটালেন।

হুযূর (সঃ)এর সাদৃশ্যের কারণে সম্মান প্রদর্শন

ইবনে আসাকির আরো লিখেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) জানতে পারলেন যে, কায়েস ইবনে রবীয়ার অবয়ব রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবয়বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) তাকে ডাকালেন। যখন তিনি দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন তখন হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) সিংহাসন থেকে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার দু চোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন আর কিছু সম্পদও তাকে দান করলেন। এর কারণ ছিল এটাই যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবয়বের সাথে তাঁর চেহারায় মিল ছিল।

আহলে বায়তের প্রতি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ভক্তি ও সম্মান

জাফর ইবনে সুলায়মান ইমাম মালেক (রহঃ)কে বেত্রাঘাত করলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাঁকে ঘরে নিয়ে রাখা হয়। পরে যখন তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসে তখন উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক আমি আমার প্রহারকারীকে ক্ষমা করে দিলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আমার মৃত্যুর আশংকা হচ্ছে। আর মৃত্যুর পর রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ হবে। সুতরাং আমার কারণে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরের কোন ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে এতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে।

আরো বর্ণিত রয়েছে যে, খলীফা মনসূর যখন জাফর থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলেন তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, আমি প্রতিশোধ গ্রহণ থেকে আল্লাহর পানাহ চাচ্ছি। আল্লাহর কসম, জাফরের সাথে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার দরুন আমি প্রতিটি চাবুক আমার শরীর থেকে পৃথক হওয়ার আগেই ক্ষমা করে দিয়েছি এবং তা হালাল করে দিয়েছি।

আবু বকর ইবনে আইয়াশ (রহঃ) বলেন, আমার কাছে যদি হযরত আবু বকর (রাযিঃ), হযরত উমর (রাযিঃ) ও হযরত আলী (রাযিঃ) কোন প্রয়োজন নিয়ে আসেন তাহলে হযরত আলী (রাযিঃ)এর প্রয়োজনকেই অগ্রাধিকার দিব। যেহেতু তাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা রয়েছে। আর আমাকে যদি আকাশ থেকে ভূমিতে নিক্ষেপ করে দেওয়া হয় তবে এটা আমার কাছে অধিক প্রিয় হবে হযরত আবু বকর (রাযিঃ)

ও হযরত উমর (রাযিঃ)কে হযরত আলী (রাযিঃ)–এর তুলনায় অগ্রাধিকার দান করা থেকে। (উল্লেখ্য যে, এটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। নচেৎ অধিকাংশের মতেই হযরত আবু বকর (রাযিঃ) ও হযরত উমর (রাযিঃ) হযরত আলী (রাযিঃ)এর তুলনায় অগ্রগণ্য।)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রীর ইন্তিকালের খবর শুনে তৎক্ষণাৎ সেজদায় পড়ে গেলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোন বিপদ দেখ তখন সেজদা কর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের ইন্তিকালের চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পারে?

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাযিঃ) হযরত উম্মে আয়মান (রাযিঃ)–এর দেখাশুনা করার জন্য যেতেন। আর বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দেখাশুনা করার জন্য যেতেন।

ফলকথা, সাইয়্যেদুল মুরসালীন হাবীবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া–সাল্লামের সম্মানের দাবী হল, তাঁর সমস্ত আহলে বায়ত ও তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সকলের সম্মান করা।

সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানের মধ্যে তাঁর সাহাবীগণের সম্মানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কুরআন–হাদীসে যদি তাঁদের ফযীলত বা মহত্ত্বের বিষয় বর্ণনা নাও করা হত, তথাপি তাঁদের সম্মান অপরিহার্য হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তাঁরা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বা সহচর। অধিকন্তু কুরআন–হাদীস ও ঈমানের মত অমূল্য সম্পদ তাঁদের অক্লান্ত সাধনা ও শ্রমের বদৌলতেই আমরা পেয়েছি। অতএব তাঁদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা ফরয ও অপরিহার্য হবে। তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন—

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ

"আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।"

কত বড় সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে আপন সন্তুষ্টির সুসংবাদ দিয়েছেন।

অপর এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ
رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ
السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۖۛ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚۛ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ
شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ؕ
وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۝

"মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল। আর যারা তার সাহচর্য লাভ করেছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কঠোর আর নিজেদের পরস্পরে অত্যন্ত সদয়। তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে কখনও রুকূ করছে ; কখনও সেজদা করছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যাপৃত। সেজদার দরুন তাদের চেহারায় বিশেষ নিদর্শন দীপ্তিমান। তাদের এসব বিবরণ তৌরাতে রয়েছে। আর ইঞ্জিলে তাদের বিবরণ হল এরূপ যেমন ফসল ; প্রথমে তার অঙ্কুর বের হল, তারপর সেটা শক্ত হল, তারপর মোটা তাজা হল, অনন্তর আপন কাণ্ডের উপর ভর করে সোজা দাঁড়াল যা দেখে কৃষকদের চক্ষু জুড়ায়। যাতে তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করেন। (যেন কাফেররা ক্ষুব্ধ হয়।) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা মাগফেরাত এবং বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।"

"আর যারা তাঁর সাহচর্য লাভ করেছে" এ বাক্যে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য যে অতি মর্যাদার বিষয় তা বর্ণনা করেছেন। আর এটা এমন মর্যাদা যার সমতুল্য আর কিছু নাই।

আর আয়াতে কারীমায় সাহচর্য ও সঙ্গ দ্বারা কায়িক ও কালিক সঙ্গ বুঝানো হয় নাই। কারণ এটা তো কাফেরদেরও লাভ হয়েছিল। বরং বিশেষ সঙ্গ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঈমান আনয়নের সাথে সাথে তাঁরা সাহায্য–সহযোগিতায়ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রয়েছেন।

উক্ত বিষয় অবশ্য অন্য বাক্য দ্বারাও ব্যক্ত করা যেত কিন্তু বিশেষ করে উপরোক্ত বাক্য দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁরা সারা জীবন প্রতি

মুহূর্তে কায়িক, আর্থিক সর্বপ্রকার সাহায্য–সহযোগিতায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রয়েছেন। অন্য কোন বাক্য দ্বারা এটা লাভ হত না।

"কাফেরদের বিরুদ্ধে অতি কঠোর" এ বাক্যটি দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের প্রচেষ্টা, জেহাদ ও ত্যাগের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতদসঙ্গে আল্লাহর উপর তাঁদের পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা থাকার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হওয়া সত্ত্বেও এবং অস্ত্র–শস্ত্র অপ্রতুল হওয়া সত্ত্বেও সর্বপ্রকার অস্ত্রে–শস্ত্রে সজ্জিত কয়েক গুণ বেশী কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর হওয়া আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল ও পূর্ণ বিশ্বাস থাকা ব্যতীত সম্ভব নয়।

এ বিষয়টিও অন্য বাক্য দ্বারা ব্যক্ত করা যেত কিন্তু বিশেষ করে বিশেষ্যবাচক বাক্য এনে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, তাঁরা সারা জীবনই উক্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এমন নয় যে, কখনও উক্ত গুণ প্রকাশ পেল আবার কখনও প্রকাশ পেল না।

"তারা পরস্পর অত্যন্ত সদয় ছিল" এতে আল্লাহ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের পরস্পর ভালবাসা, সম্প্রীতি, দয়া প্রভৃতি সুসম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। এ ক্ষেত্রেও বিশেষ্যবাচক বাক্য আনয়নকরতঃ ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁরা সারাজীবন পরস্পর ভালবাসা, দয়া ও হৃদ্যতার ভিতর দিয়ে কাটিয়েছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে এগুণে গুণান্বিত ছিলেন। কখনও এ গুণ থেকে বিচ্যুত হন নাই। কখনও যদি তাদের পরস্পরে কোন মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তা ছিল ইজতেহাদী। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজকে হকের উপর মনে করেছেন। আর এর পিছনে তাদের যুক্তিও ছিল। শুধু প্রবৃত্তির তাড়নায় করেছেন তা নয়। আর এটা কারো পক্ষে তখনই সম্ভব যখন সমস্ত মন্দ চরিত্র যথা, অহংকার, কার্পণ্য, ক্রোধ, হিংসা, লোভ, মর্যাদা, মোহ ইত্যাদি থেকে মুক্ত হয়ে উত্তম চরিত্র যথা, বিনয়, দানশীলতা, অল্পেতুষ্টি, এখলাস প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হতে পারে এবং এগুলো তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। উল্লেখিত আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের মন্দ চরিত্রসমূহ থেকে মুক্ত হওয়া এবং উত্তম চরিত্রসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত হওয়া প্রমাণিত হচ্ছে।

"তুমি তাদের দেখতে পাবে তারা রুকু করছে, সেজদা করছে" এ আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের ইবাদতের আধিক্য বর্ণনা করেছেন যে, তুমি তাদেরকে যখনই দেখ তখন তাদেরকে ইবাদতরত দেখতে পাবে। ইবাদতের আধিক্য তখনই

সম্ভব যখন ইবাদতে স্বাদ অনুভব হয়। আর ইবাদতে স্বাদ অনুভব হয় ইহসানের মাধ্যমে। ইহসানের অর্থ হচ্ছে, ইবাদত এভাবে করা যেন আমি আল্লাহ পাককে স্বচক্ষে দেখছি। এ অবস্থা সৃষ্টি না করতে পারলে কমপক্ষে এতটুকু হওয়া চাই যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন। যখন বান্দার মধ্যে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় তখন সে ইবাদতে স্বাদ অনুভব করে। আর তখনই অধিক পরিমাণে ইবাদত করতে পারে।

অনন্তর তার মধ্যে এমন এক স্থায়ী অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, যারফলে গোনার প্রতি ঘৃণা ও নেক কাজের প্রতি আগ্রহ জন্মে। তখন সর্বকাজে তার একমাত্র লক্ষ্য থাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। পরবর্তী বাক্যে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ "তাদের জীবনের লক্ষ্যই ছিল আল্লাহর অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি অর্জন।" এটাই ছিল তাদের প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য। যদি তাদের পরস্পরে কখনও মতপার্থক্যের সৃষ্টি হত তবে সেক্ষেত্রেও প্রত্যেকের লক্ষ্য থাকত আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর নিয়ত থাকত সম্পূর্ণ খালেস ও নির্ভেজাল।

তাঁদের প্রত্যেক কাজে ইখলাস ও সৎ নিয়ত থাকার বিষয়টি এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়— "সেজদার দরুণ তাঁদের চেহারায় বিশেষ নিদর্শন দীপ্তিমান।" এ আয়াতে অধিক ইবাদত ও ইখলাসের দরুন সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় যে নূর চমকাত তা বর্ণনা করা হয়েছে। কবির ভাষায়—

مــــرد حــــقّــــانی کی پیـــشــــانی کـــا نور
کب چھـــپـــا رهتـــا هے پیش ذی شـــعـــور

"হাক্কানী ব্যক্তির চেহারার নূর কোন অনুভূতিশীল ব্যক্তির কাছে গোপন থাকতে পারে না।"

"তাদের এসব বিবরণ তৌরাতে রয়েছে" এ বাক্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তৌরাতে সাহাবায়ে কেরামের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এমনিভাবে পরবর্তী বাক্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ইঞ্জিলেও তাঁদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার দরবারে তাদের মনোনীত ও পছন্দনীয় হওয়ার প্রমাণ।

"যাতে তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করেন" এ বাক্য দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করা। অতএব কাফেররা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি সর্বদা ক্ষুব্ধ থাকবে এবং তাঁদের

প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে।

"যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে" এ বাক্যে সাহাবায়ে কেরামের ঈমান ও সমস্ত আমল আল্লাহর দরবারে গৃহীত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

"তাদের সম্পর্কে আল্লাহ মাগফেরাত ও বিরাট প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন" এ বাক্যে সাহাবায়ে কেরাম থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিপন্থী কোন কাজ হয়ে গেলে তা ক্ষমা করে দেওয়ার ওয়াদা এবং ক্ষমার সাথে সাথে বিরাট প্রতিদান দেয়ার প্রতিশ্রুতিও করা হয়েছে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে বিরাট প্রতিদান আখ্যা দিয়েছেন তা কত মহান হবে সেটা কল্পনাও করা যায় না।

সাহাবায়ে কেরাম অনুসৃত ব্যক্তিবর্গ সত্যের মাপকাঠি

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

"আর সেসব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনয়নের ব্যাপারে) প্রবীণ ও প্রথম পর্যায়ের এবং যারা ইখলাসের সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাদের সবার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদের জন্য এমন বাগানসমূহ তৈরী করে রেখেছেন যেগুলোর তলদেশে নির্ঝর প্রবাহিত হবে, যেগুলোতে তারা চিরকাল থাকবে। এটা অতি মহান কামিয়াবী।"

আয়াতে কারীমায় সাহাবায়ে কেরামের মহত্ত্ব প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এটাও প্রমাণ হচ্ছে যে, তাঁরা পরবর্তীদের জন্য অনুসৃত ব্যক্তিবর্গ। যারা তাদের অনুসরণ করবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকেও আপন সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ দান করেছেন। অবশ্য প্রথম স্তরের এবং সরাসরি অনুসারী তাবেয়ীন প্রথম পর্যায়ে রয়েছেন। আর আয়াতের ব্যাপকতার দিকে লক্ষ্য করা হলে কেয়ামত পর্যন্ত যতলোক আসবে এবং সঠিকভাবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে সবাই তাদের অনুসারী হিসাবে গণ্য এবং উক্ত সুসংবাদ সবার জন্যই।

আলোচ্য আয়াত দ্বারা প্রত্যেক সাহাবী আদর্শ, অনুসরণযোগ্য এবং সত্যের মাপকাঠি এ বিষয়টিও প্রমাণিত হল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টিই নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণনা করেছেন—

اَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"আমার সাহাবীরা নক্ষত্রসদৃশ। তাদের মধ্যে তোমরা যে কারো অনুসরণ করবে হেদায়াত পেয়ে যাবে।"

এ হাদীস সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণযোগ্য ও সত্যের মাপকাঠি হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ।

সাহাবায়ে কেরামের উন্নত গুণাবলী

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ○

"ঐসব ঈমানদারের মধ্যে কতক লোক এমন রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তাতে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অনন্তর তাদের মধ্যে কতক লোক এমন যারা আপন মান্নত পূর্ণ করে ফেলেছে। আর কতক তার অপেক্ষায় আছে। আর তারা সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটায় নাই।"

উক্ত আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের বহু গুণ প্রমাণিত হয়েছে। যথা–

(১) সততা ও অঙ্গীকারে দৃঢ়তা। কারণ, তারা আল্লাহ এবং রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেসব ওয়াদা করেছেন সেগুলো পূরণ করেছেন।

(২) স্বীয় জান-মাল বিসর্জন দিয়ে শাহাদতের মর্যাদালাভ করা তাদের লক্ষ্য ছিল। কারণ "যারা আপন মান্নত পূরণ করে ফেলেছে" ঐসব লোকের সম্বন্ধে নাযিল হয়েছে যারা শাহাদত বরণ করেছেন।

(৩) সাহাবায়ে কেরাম শাহাদতবরণ করার জন্য উৎসুক ও প্রতীক্ষমান ছিলেন। "কতক তার অপেক্ষায় আছে" এতে এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

(৪) এসব গুণ তাদের মধ্যে সাময়িকভাবে ছিল না বরং স্থায়ীভাবে ছিল। আমরণ তারা এসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এতে কোনরূপ পরিবর্তন আসে নাই। "তারা সামান্য একটু পরিবর্তনও ঘটায় নাই"–এর দ্বারা এটাই বর্ণনা করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের আরও কয়েকটি মহৎ গুণ

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ
وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ

"কিন্তু আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ঈমানের ভালবাসা দান করেছেন এবং তা তোমাদের অন্তরে পছন্দনীয় করে দিয়েছেন আর কুফর, ফিস্‌ক এবং গোনাহকে তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। বস্তুতঃ ঐসব লোক সরল ও সঠিক পথের উপর রয়েছে।"

উক্ত আয়াত দ্বারাও সাহাবায়ে কেরামের কতিপয় গুণ প্রমাণিত হচ্ছে। যথা—

(১) আল্লাহ তাআলা ঈমানকে তাঁদের প্রিয় বস্তু করে দিয়েছিলেন।

(২) ঈমান তাঁদের অন্তরে সুসজ্জিত করে দিয়েছিলেন।

(৩) কুফর এবং অন্যান্য সমস্ত নাফরমানীর প্রতি তাদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। যখন কারো মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যাবে তখন তার জন্য ঈমানের সমস্ত চাহিদাকে পূরণ করা এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকা অনিবার্য বিষয় হয়ে যাবে।

অতএব আল্লাহ তাআলা যাদের সাথে এ ধরনের আচরণ করেছেন তাদের অনুসরণীয় হওয়ার ব্যাপারে এবং সত্যের মাপকাঠি হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ থাকতে পারে কি?

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

"আর এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে এমন এক উম্মত (সম্প্রদায়) বানিয়ে দিয়েছি যারা (প্রত্যেক বিষয়ে) মিতাচার।"

উক্ত সম্বোধনের প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে সাহাবায়ে কেরাম। স্বয়ং আল্লাহ পাক যাদের মিতাচার হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তারা সত্যের মাপকাঠি না হলে আর কে হবে?

বোখারী শরীফে উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে 'ওসাতান' এর অর্থ করা হয়েছে 'ন্যায়পরায়ণ'। যদ্দ্বারা সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের ন্যায়পরায়ণ হওয়ার

বিষয় প্রমাণিত হয়। অতএব আল্লাহ তাআলা যাদের সম্পর্কে ন্যায়পরায়ণ ও মিতাচার হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তাদের সম্পর্কে দুর্নীতিপরায়ণ ও অমিতাচার বলে আখ্যায়িত করা কতটুকু অন্যায় তা সামান্য ঈমান ও সাধারণ বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا
بِالْاِيْمَانِ

"আর যারা তাদের পরে আসে এবং এ দোআ করে যে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের ঐ সকল ভাইকে ক্ষমা করে দাও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছে।"

সাহাবায়ে কেরামের জন্য দোআ

উল্লেখিত আয়াতে "যারা আমাদের পূর্বে ঈমান আনয়ন করেছে" দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে বুঝানো হয়েছে। তাঁদের জন্য দোআ করাকে আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত পছন্দ করেছেন। এতেও আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে, সেটা প্রকাশ পাচ্ছে।

কুরআনে কারীমের বহু আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের মহত্ত্ব ও মর্যাদার বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কেবল নমুনাস্বরূপ কতিপয় আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। এখন কতিপয় হাদীসও এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হচ্ছে—

সাহাবায়ে কেরাম উজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ

اَصْحَابِىْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

"আমার সাহাবীগণ উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ। তাদের যে কারো অনুসরণ করবে হেদায়াত পেয়ে যাবে।"

"হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

مَثَلُ اَصْحَابِىْ كَمَثَلِ الْمِلْحِ فِى الطَّعَامِ

"আমার সাহাবীগণ খাবারের লবণসদৃশ।"

অর্থাৎ যেমনিভাবে লবণের সাথে খাবারের স্বাদ ও উৎকর্ষ সম্পৃক্ত তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণের সাথে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সম্পৃক্ত।

অন্যদের উহুদ বরাবর সোনা দান সাহাবায়ে কেরামের এক মুদ বা আধা মুদের সমানও হবে না

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوْا اَصْحَابِىْ فَلَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ يُنْفِقُ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهٗ

"হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি 'দিও না। কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা খরচ করে তবে তা তাদের কোন একজনের এক মুদ (প্রায় এক সের পরিমাণ) বা আধা মুদের সমানও হবে না।"

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের ইখলাস ও সৎ নিয়েতের অনুমান করা যেতে পারে। কারণ আমলের সওয়াব ও আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়া নির্ভর করে ইখলাস ও সৎ নিয়তের উপর। ইখলাস যত বেশী থাকবে এবং নিয়ত যত বেশী বিশুদ্ধ হবে সওয়াব তত বেশী লাভ হবে।

সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দিও না

পূর্বেও এ হাদীসখানি উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর। আমার পর তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু করো না। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসল, সে আমার কারণেই ভালবাসল। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করল, সে আমার কারণেই বিদ্বেষ পোষণ করল। যে তাদেরকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিল। আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে আল্লাহকে কষ্ট দিল। আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল অচিরেই আল্লাহ তাকে গ্রেফতার করে ফেলবেন।

সাহাবায়ে কেরামকে গালি দিও না

مَنْ سَبَّ اَصْحَابِىْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا

"যে ব্যক্তি আমার সাহাবীগণকে গালি দিবে তার উপর আল্লাহর লানত (অভিশাপ), ফেরেশতাগণের লানত এবং সমস্ত মানুষের লানত পতিত হবে। আর আল্লাহ তার ফরয, নফল কোন ইবাদতই কবূল করবেন না।"

অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে—

وَاِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِىْ فَاَمْسِكُوْا

"যখন তোমাদের নিকট আমার সাহাবীগণের আলোচনা করা হয় তখন তাদের সমালোচনা থেকে বিরত থাক।"

সাহাবায়ে কেরাম নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ اخْتَارَ اَصْحَابِىْ عَلَى جَمِيْعِ الْعَالَمِيْنَ سِوَى النَّبِيِّيْنَ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَاخْتَارَ لِىْ مِنْهُمْ اَرْبَعَةً اَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيًّا فَجَعَلَهُمْ خَيْرَ اَصْحَابِىْ وَفِىْ اَصْحَابِىْ كُلِّهِمْ خَيْرٌ

"আল্লাহ তাআলা আমার সাহাবীগণকে নবী রাসূল ছাড়া সমস্ত জগতের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তন্মধ্যে আবু বকর (রাযিঃ), উমর (রাযিঃ), উসমান (রাযিঃ) ও আলী (রাযিঃ) এ চার জনকে আমার জন্য মনোনীত করেছেন। তাদেরকে সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ করেছেন আর আমার প্রত্যেক সাহাবীর মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ غَفَرَ لِاَهْلِ بَدْرٍ وَالْحُدَيْبِيَةِ اِحْفَظُوْنِىْ فِىْ اَصْحَابِىْ وَاَصْهَارِىْ وَاَخْتَانِىْ لَا يُطَالِبَنَّكُمْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ بِمَظْلَمَةٍ فَاِنَّهَا مَظْلَمَةٌ تُوْهَبُ فِى الْقِيَامَةِ غَدًا

"আল্লাহ তাআলা বদরের যুদ্ধে এবং হোদাইবিয়ার সন্ধিতে অংশগ্রহণ–কারীদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতএব আমার সাহাবীগণ, আমার শ্বশুরপক্ষীয় আত্নীয়–স্বজন ও আমার জামাতাদের ব্যাপারে আমার রেয়াত করো। তাদের মধ্য হতে কেউ যেন কোন জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের দাবী না করে। কারণ এটা এমন জুলুম, কাল–কেয়ামতের দিন যার কোন বিনিময় দেওয়া সম্ভব হবে না।"

এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার রেয়াত করেছে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে হেফাযত করবেন। আর যে আমার রেয়াত করে নাই আল্লাহ তার থেকে মুক্ত। আর আল্লাহ যার থেকে মুক্ত থাকেন অচিরেই তাকে গ্রেফতার করবেন।

এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আমার হকের হেফাযত করবে কেয়ামতের দিন আমি তার হকের হেফাযত করব।

তাবরানী শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে আছে, যে আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আমার অধিকার সংরক্ষণ করবে সে হাউজে কাউছারের পানি পান করে পরিতৃপ্তি লাভ করবে। আর যে আমার অধিকার সংরক্ষণ করবে না সে হাউজে কাউছারের পানি পান করে পরিতৃপ্তিও লাভ করবে না, আমাকে দূর থেকে ছাড়া কাছে থেকে দেখতে পাবে না।

সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী কাফের

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে সে কাফের। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন— "তাদের দ্বারা কাফেরদেরকে ক্ষুব্ধ করেন।"

মুক্তি লাভের দুটি বিশেষ গুণ

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) বলেন, যার মাঝে দুটি বিষয় পাওয়া যাবে সে নাজাত পাবে। একটি হচ্ছে, আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির শানে সততা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের প্রতি ভালবাসা।

চার খলীফার প্রতি মহব্বত

আবু আইয়ূব সাখতিয়ানী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হযরত আবু বকর

(রাযিঃ)কে ভালবেসেছে সে দ্বীন কায়েম করেছে। যে হযরত উমর (রাযিঃ)কে ভালবেসেছে সে আল্লাহর পথকে আলোকিত করেছে। যে হযরত উছমান (রাযিঃ)কে ভালবেসেছে সে আল্লাহর নূর দ্বারা ধন্য হয়েছে। যে হযরত আলী (রাযিঃ)কে ভালবেসেছে সে মজবুত হাতল ধারণ করেছে। যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমস্ত সাহাবীর প্রশংসা করেছে সে নেফাক থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি তাদের কোন একজনের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেছে সে বেদআতী, সুন্নত ও সমস্ত সলফে সালেহীনের বিরোধিতাকারী। আমার আশংকা হচ্ছে, সে যতক্ষণ না সমস্ত সাহাবীকে ভালবাসবে এবং তার অন্তর তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ থেকে মুক্ত হবে তার কোন আমল কবুল হবে না।

জনৈক তত্ত্বজ্ঞানী আলেম বলেছেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর ঘোড়ার নাকের ঐ ধূলি যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (কোন যুদ্ধে) থাকার দরুন লেগেছে তা সহস্র উমর ইবনে আবদুল আযীযের তুলনায় উত্তম।

হযরত উছমানের প্রতি বিদ্বেষের পরিণতি

তিরমিযী শরীফে এক হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাযার নামায পড়ার জন্য জনৈক ব্যক্তির লাশ আনা হল। কিন্তু তিনি ঐ ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন না। এর কারণ স্বরূপ বললেন, এ ব্যক্তি উছমানের প্রতি বিদ্বেষ রেখেছে আমিও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখি।

আনসারী সাহাবীগণ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা তাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি ক্ষমা করে দাও আর তাদের গুণাবলী স্বীকার কর।

সাহল ইবনে আবদুল্লাহ বলেন—

لَمْ يُؤْمِنْ بِالرَّسُوْلِ مَنْ لَّمْ يُوَقِّرْ اَصْحَابَهُ وَلَمْ يُعِزَّ اَوَامِرَهُ

"যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের সম্মান করে নাই এবং তাঁর আদেশসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে নাই সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনে নাই।"

আলোচ্য আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের অগণিত গুণ–মর্যাদা ও মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় যেগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন একান্ত জরুরী। এতদসঙ্গে রাফেযী, বেদআতপন্থী, ভ্রান্তসম্প্রদায় এবং অনির্ভরযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারীগণ সাহাবায়ে কেরামের পরস্পর মতবিরোধ সম্পর্কিত যেসব ঘটনাবলী বিকৃত ও অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করেছে সেগুলো প্রত্যাখ্যান করতে হবে অথবা সেগুলোর উপযুক্ত কোন ব্যাখ্যা করতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের পূর্ণ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নসীব করুন। আর তাঁদের সম্বন্ধে তাঁদের মান–মর্যাদার পরিপন্থী কোন একটি শব্দও উচ্চারণ করা থেকে হেফাযত করুন। আমীন॥

রাসূলে করীম (সঃ)-এর সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত বিষয়ের শ্রদ্ধা ও সম্মান

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা ও শ্রদ্ধার দাবী হল তাঁর সাথে সম্পৃক্ত সমস্ত বিষয়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা পোষণ করা।

হযরত আবূ মাহযূরা (রাযিঃ)এর চুল না কাটা

সাফিয়্যা বিনতে নাজদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আবু মাহযূরা (রাযিঃ)এর মাথায় বেশ দীর্ঘ চুল ছিল। তিনি সেগুলো খোঁপা বেঁধে রাখতেন। খোঁপা খুলে ছেড়ে দিলে মাটিতে গিয়ে পড়ত। তাঁকে মাথার চুল মুণ্ডাতে বলা হলে তিনি বললেন, আমি সেই চুল মুণ্ডাতে পারব না যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক হাতের স্পর্শ লেগেছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরের যেস্থানে বসতেন সেস্থানে হাত রেখে সে হাত চেহারায় বুলাতে দেখা গেছে।

কেশ মোবারকের সংরক্ষণ

হযরত খালেদ বিন ওলীদ (রাযিঃ)এর টুপিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ মোবারক ছিল। কোন এক যুদ্ধে টুপিটি মাটিতে পড়ে গেলে

তৎক্ষণাৎ তিনি টুপিটি উঠিয়ে আবার মাথায় দৃঢ়ভাবে বেঁধে নিলেন। এতে একটু দেরী হয়ে গেল। তুমুল যুদ্ধের সময় এ কাজটি অন্যান্যদের কাছে আপত্তিকর বলে বিবেচিত হল। প্রশ্ন করা হলে জবাবে তিনি বললেন, আমি শুধু টুপির জন্য এরূপ করি নাই। বরং টুপিতে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ মুবারক সংযুক্ত ছিল। আমার আশংকা হল যদি এর হেফাযত না করি তাহলে একদিকে এর বরকত থেকে আমি বঞ্চিত হয়ে যাব অপরদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কেশ মুবারক মুশরেকদের পায়ের নীচে পড়ে পদদলিত হবে। তাই আমি এরূপ করেছি।

মদীনা শরীফে সওয়ারীর উপর আরোহন না করা

ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনা মুনাওয়ারায় সাওয়ারী (উট বা ঘোড়া)এর উপর আরোহণ করতেন না। তিনি বলতেন, আল্লাহর কাছে আমার লজ্জাবোধ হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মাটিতে শায়িত আছেন সেটা আমি আমার সাওয়ারী দ্বারা পদদলিত করব।

ওযূ ছাড়া ধনুক স্পর্শ না করা

আহমদ ইবনে ফাদ্‌লুওইয়াহ্‌ (রহঃ) বিখ্যাত সাধক, তিরন্দাজ ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, যখন আমি জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনুক স্পর্শ করেছেন তখন থেকে আমি ওযু ব্যতীত ধনুক স্পর্শ করি না।

মদীনা শরীফের মাটিকে নিকৃষ্ট বলার শাস্তি

জনৈক ব্যক্তি ইমাম মালেক (রহঃ)এর সামনে মদীনা মুনাওয়ার মাটিকে নিকৃষ্ট মাটি বলেছিল। ইমাম মালেক (রহঃ) তাকে ত্রিশটি বেত্রাঘাত করতে এবং কয়েদ করতে আদেশ করেন। আর বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মাটিতে শায়িত আছেন সে মাটিকে এ ব্যক্তি নিকৃষ্ট বলেছে। এ তো মৃত্যুদণ্ডের উপযুক্ত হয়ে গেছে।

বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের হাদীস—রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনার মাটিতে কোন বেদআত বের করবে অথবা কোন বেদআতীকে স্থান দিবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের লা'নত পতিত হবে। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত কবুল হবে না।

হুযূর (সঃ)-এর ছড়ি মুবারকের প্রতি অসম্মানের পরিণতি

জাহ্জাহা গিফারী নামক এক ব্যক্তির ঘটনা—সে একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছড়ি মুবারক যা হযরত উছমান (রাযিঃ)এর নিকট ছিল তার হাতে নিয়ে হাঁটুতে রেখে ভাঙ্গতে চাইল। সবাই তাকে বাধা দিল কিন্তু সে এ থেকে বিরত রইল না। পরিণামে তার হাঁটুতে পচন ধরে যায়। এ রোগ সারা শরীরে ছড়িয়ে যেতে পারে এ আশংকায় সে হাঁটু কেটে ফেলে। আর কিছু দিন পরেই তার মৃত্যু ঘটে।

মদীনা শরীফের সম্মানার্থে বাহন থেকে নেমে যাওয়া

আবুল ফযল জাওহারীর ঘটনা—তিনি রাওজা মুবারকের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যখন মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছুলেন, জনবসতির নিকটে এসে যানবাহন থেকে নেমে গেলেন এবং নিম্নোল্লেখিত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করলেন—

وَلَمَّا رَأَيْنَا رَسْمَ مَنْ لَّمْ يَدَعْ لَنَا * فُؤَادًا لِعِرْفَانِ الرُّسُوْمِ وَلَا لُبًّا

نَزَلْنَا عَنِ الْاَكْوَارِ نَمْشِىْ كَرَامَةً * لِمَنْ بَانَ عَنْهُ اَنْ نُّلِمَّ بِهِ رَكْبًا

"যখন আমরা ঐ সত্তার নিদর্শনাবলী দেখতে পেলাম যার ভালবাসা সেসব নিদর্শন চিনতে আমাদের অন্তর বা বিবেক বাকী রাখে নাই তখন সে সত্তার সম্মানে আমরা যানবাহন থেকে নেমে পায়ে হেঁটে চললাম। কারণ যানবাহনে আরোহন করে চললে সেটা আমাদের জন্য বড় অপরাধ হয়ে যেতে পারে।"

জনৈক আশেকে রাসূল মদীনার নিকটে পৌঁছুলে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো আবৃত্তি করেন—

رُفِعَ الْحِجَابُ لَنَا فَلَاحَ لِنَاظِرٍ * قَمَرٌ تَقَطَّعُ دُوْنَهُ الْاَوْهَامُ

وَاِذَا الْمَطِيُّ بَلَغْنَ بِنَا مُحَمَّدًا * فَظُهُوْرُهُنَّ عَلَى الرِّجَالِ حَرَامُ

قَرَّبْنَنَا مِنْ خَيْرِ مَنْ وَطِئَ الثَّرٰى * فَلَهَا عَلَيْنَا حُرْمَةٌ وَّذِمَامُ

"আমাদের সম্মুখ হতে যবনিকা সরিয়ে নেওয়া হল। অতএব আমাদের সামনে এমন এক চন্দ্র বিকশিত হয়ে উঠল যার কাছে বিবেক বিমূঢ়িত।

যখন সাওয়ারীগুলো আমাদেরকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছিয়ে দিল তখন ওদের পৃষ্ঠ আমাদের জন্য হারাম হয়ে গেল।

ওরা আমাদেরকে পবিত্র ভূমিতে বিচরণ করে বরকত ও পুণ্যলাভের সুযোগ করে দিয়েছে অতএব ওদের সম্মান করা আমাদের জন্য অপরিহার্য।"

পায়ে হেঁটে হজ্জ পালনের কারণ

জনৈক শায়েখ পদব্রজে হজ্জ পালন করেন। কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, পলাতক গোলাম মনিবের কাছে যানবাহনে চড়ে হাজির হয় কি? আমি যদি মাথার উপর ভর করে চলতে সক্ষম হতাম তাহলে পায়ে হেঁটে চলতাম না।

জনৈক প্রেমিক যথার্থ বলেছে—

چو رسی به کوئے دلبر بسپار جان مضطر

کہ مباد بار دیگر نرسی بدین تمنا

"তুমি যখন প্রেমাষ্পদের গলিতে এসেছ তখন অসহায় প্রাণকে তার সোপর্দ করে দাও। কারণ এ সুযোগ পুনরায় নাও পেতে পার।"

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

সপ্তম হক

অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম পাঠ করা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সমস্ত হক বা প্রাপ্য আমাদের কাছে রয়েছে তন্মধ্যে একটি হল তাঁর প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ ও সালাম পাঠ করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি রহমত পাঠান। অতএব হে ঈমানদাররা! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠাও।"

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা রাসূলে করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠানোর আদেশ করেছেন। যদ্দ্বারা দরূদ ও সালাম পাঠের অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। তাই অধিকাংশ আলেমের মতে জীবনে কমপক্ষে একবার দরূদ পড়া ফরয। আর কতক আলেমের মতে যখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম আসে তখনই দরূদ পড়া ওয়াজেব। হানাফী আলেমদের এব্যাপারে দুধরনের উক্তিই রয়েছে। ইমাম কারখী (রহঃ) প্রথমোক্ত উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর ইমাম তাহাবী (রহঃ) দ্বিতীয় উক্তিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

রাসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি দরূদ না পড়ার ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُحْضُرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا فَلَمَّا ارْتَقٰى دَرَجَةً قَالَ اٰمِيْنَ ثُمَّ ارْتَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ اٰمِيْنَ ثُمَّ ارْتَقَى الثَّالِثَةَ فَقَالَ اٰمِيْنَ فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ الْيَوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ فَقَالَ اِنَّ جِبْرِيْلَ

عَرَضَ لِيْ فَقَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ قُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّانِيَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ اٰمِيْنَ فَلَمَّا رَقِيْتُ الثَّالِثَةَ قَالَ بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ الْكِبَرُ عِنْدَهُ اَوْ اَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ قُلْتُ اٰمِيْنَ

"হযরত কা'ব ইবনে উজরা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা মিম্বরের কাছে এসে যাও। সবাই মিম্বরের কাছে এসে গেল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন তখন বললেন, আমীন। যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখলেন তখনও বললেন আমীন। তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখার সময়ও বললেন আমীন। খুৎবা সমাপ্ত করার পর যখন নীচে নেমে এলেন তখন আমরা নিবেদন করলাম, হুযূর! আজ আমরা আপনাকে এমন কথা বলতে শুনেছি যা পূর্বে কখনও শুনি নাই। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এই মাত্র জিব্রাঈল (আঃ) এসেছিলেন। যখন আমি প্রথম সিঁড়িতে পা রাখি তখন তিনি বললেন, ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি যে রমযান মাস পেল কিন্তু তার গোনাহ মাফ হল না। তখন আমি বললাম, আমীন। আমি যখন দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা রাখি তখন তিনি বললেন, ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি যার সামনে আপনার নাম নেওয়া হল কিন্তু সে আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করল না। তখন আমি বললাম আমীন। যখন তৃতীয় সিঁড়িতে পা রাখি তখন তিনি বললেন, ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি যে পিতামাতা উভয়কে অথবা তাদের কোন একজনকে বার্ধক্যাবস্থায় পেল কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালো না। তখন আমি বললাম আমীন।

উল্লেখিত হাদীসে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তিনটি বদদোআ করেছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটির পরে আমীন বলেছেন। একে তো হযরত জিব্রাঈল (আঃ)এর মত আল্লাহর সান্নিধ্য লাভকারী ফেরেশতার বদদোআ, তার সাথে নবীকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমীনের সংযোজন। এটা কত কঠিন বদদোআ তা অতি সহজেই অনুমেয়। আর এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে তাঁর প্রতি দরূদ না পড়ার বিভীষিকার অনুমান হয়ে গেল।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আপন অনুগ্রহে এসব বদদোআর উপযোগী হওয়া থেকে মুক্ত রাখুন।

অপর এক হাদীসে আছে—

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الْبَخِيْلُ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهٗ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ

"হযরত আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পূর্ণ কৃপণ ঐ ব্যক্তি, যার সামনে আমার আলোচনা করা হল কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।"

আল্লামা সাখাবী চমৎকার চরণ উল্লেখ করেছেন—

مَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ اِنْ ذُكِرَ اسْمُهٗ * فَهُوَ الْبَخِيْلُ وَزِدْهُ وَصْفَ جَبَانٍ

"যার সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নেওয়া হল কিন্তু সে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করল না সে পাকা কৃপণ তদসঙ্গে সে কাপুরুষও বটে।"

عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَفَاءِ اَنْ اُذْكَرَ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَا يُصَلِّىْ عَلَيَّ

"কাতাদাহ (রহঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এটা হল জুলুম যে, কারো সামনে আমার আলোচনা করা হল কিন্তু সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এত বড় হিতৈষী এবং দাতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ না করা নিঃসন্দেহে জুলুম।

হযরত আবু হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কোন দল কোন মজলিসে বসল আর সে মজলিসে আল্লাহর যিকির করা হল না এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করা হল না উক্ত মজলিস কেয়ামতের দিন তাদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের

ক্ষমাও করতে পারেন অথবা শাস্তিও দিতে পারেন।

অপর এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তির সামনে আমার আলোচনা করা হল আর সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না, সে জান্নাতের পথ ভুল করে ফেলেছে।

আলোচ্য হাদীসসমূহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে দরূদ পাঠ না করার ব্যাপারে যেসব ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে সেগুলো দ্বারা দরূদ পাঠ ওয়াজেব ও জরুরী বলে প্রমাণিত হয়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করার ফযীলত ও মাহাত্ম্য

(اَبُوْطَلْحَةَ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالسُّرٰى فِىْ
وَجْهِهٖ فَقُلْنَا اِنَّا لَنَرَى السُّرٰى فِىْ وَجْهِكَ قَالَ اِنَّهٗ اَتَانِى الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
اِنَّ رَبَّكَ يَقُوْلُ اَمَا يُرْضِيْكَ اَنَّهٗ لَا يُصَلِّىْ عَلَيْكَ اَحَدٌ اِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا
يُسَلِّمُ عَلَيْكَ اَحَدٌ اِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا

"হযরত আবু তালহা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, একদা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। তখন তাঁর চেহারায় প্রফুল্লতা উদ্ভাসিত হচ্ছিল। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে আজ অত্যন্ত আনন্দিত দেখা যাচ্ছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কাছে ফেরেশতা এসে বলেছেন, হে মুহাম্মদ! আপনার প্রভু বলেছেন, আপনি কি এতে সন্তুষ্ট না যে, আপনার উম্মতের কেউ আপনার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করলে আমি তার প্রতি দশটি রহমত নাযিল করব আর যে কেউ আপনার প্রতি একবার সালাম পাঠায় আমি তার প্রতি দশবার সালাম পাঠাব?"

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ عِنْدَ قَبْرِىْ سَمِعْتُهٗ وَمَنْ صَلّٰى عَلَيَّ نَائِيًا اُبْلِغْتُهٗ

হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটে থেকে সালাম পাঠ করে

আমি তার সালাম স্বয়ং শুনি আর যে ব্যক্তি দূর থেকে সালাম পাঠ করে আমার নিকট তা পৌছান হয়।

إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ مِنْ أُمَّتِيَ السَّلَامَ

হযরত ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলার কিছু সংখ্যক ভ্রমণকারী ফেরেশতা রয়েছে, তাঁরা উম্মতের সালাম আমার কাছে পৌছায়।

দরূদ ও সালামের ফযীলত ও মাহাত্ম্য বহু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আলোচনা সংক্ষিপ্ত করণের লক্ষ্যে কেবল তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হল। এ থেকেই অনুমান করা যায় দরূদ ও সালাম আল্লাহর কাছে কত প্রিয়। দরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহ তাআলা দশগুণ বেশী রহমত বর্ষণ করেন। রাওজার নিকট দরূদ পাঠ করলে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং শুনেন এবং তিনি তার জবাব দেন। এটা অত্যন্ত সৌভাগ্য ও গৌরবের বিষয়।

আল্লামা সাখাভী (রহঃ) সুলায়মান ইবনে নুজায়েমের এক স্বপ্ন বর্ণনা করেন—সুলায়মান ইবনে নুজায়েম বলেন, আমি স্বপ্নযোগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষ যে আপনার রাওজায় হাজির হয়ে আপনাকে সালাম করে আপনি কি তাদের সালাম বুঝতে পারেন? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তাদের সালাম বুঝতে পারি এবং তাদের সালামের জবাবও দিয়ে থাকি।

ইব্রাহীম ইবনে শাইবান (রহঃ) বলেন, হজ্জ কার্য সমাপ্ত করে আমি মদীনা মুনাওয়ারায় গেলাম এবং রাওজা মোবারকের নিকট হাজির হয়ে সালাম নিবেদন করলাম। তখন হুজরা শরীফের ভিতর থেকে 'ওয়াআলাইকাস্ সালাম' শুনতে পেলাম।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, রাওজা মুবারকের নিকটে দরূদ পাঠ করা নিঃসন্দেহে উত্তম। কারণ নিকটে থাকলে যে মনোযোগ ও একাগ্রতা লাভ হবে তা দূরে থাকলে লাভ হবে না।

মাযাহেরে হক কিতাবের গ্রন্থকার উল্লেখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, রাওজা

মুবারকের নিকট থেকে সালাম পাঠ করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং শুনতে পান। আর দূর থেকে পাঠ করলে ফেরেশতারা তাঁর কাছে পৌছিয়ে দেয়। তবে সালামের জবাব উভয় অবস্থাতেই দিয়ে থাকেন।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা সালাম পাঠকারীর মর্যাদা বিশেষ করে অধিক পরিমাণে সালাম পাঠকারীর মর্যাদা কত মহান তা প্রমাণিত হয়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে জীবনে একটি সালামের জবাব এলেও তা সৌভাগ্যের বিষয়। সেক্ষেত্রে প্রতিটি সালামের জবাবই আসছে।

بهر سلام مکن رنجه در جواب آں لب
که صد سلام مرابس یکے جواب از تو

"আপনার কোমল ওষ্ঠকে আমার প্রত্যেক সালামের জবাব দিয়ে কষ্ট দিবেন না। আমার শত সালামের বিনিময়ে আপনার একটি জবাবই যথেষ্ট।"

এই মর্মে আল্লামা সাখাভী (রহঃ) বলেন, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে কারো প্রশংসামূলক আলোচনা হওয়াটাই তার মর্যাদার জন্য যথেষ্ট।

নিম্নোক্ত চরণ দুটিও এ মর্মেই বলা হয়েছে—

وَمَنْ خَطَرَتْ مِنْهُ بِبَالِكَ خَطْرَةٌ
حَقِيْقٌ بِأَنْ يَّسْمُوْا وَأَنْ يَّتَقَدَّمَ

"যে সৌভাগ্যের কল্পনাই তোমার অন্তরে আসে সেটা এর দাবীদার যে, যত ইচ্ছা গর্ব করবে, যত ইচ্ছা নৃত্য করবে।" (অর্থাৎ আনন্দে লাফাবে।)

রাওযা মুবারকের যিয়ারত

পূর্বে বিবৃত হয়েছে যে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসার আলামতসমূহের একটি হল তাঁর রাওজা মুবারকের যিয়ারত করা। যিয়ারতের সামর্থ্য না হলে এর আকাংখা করা এবং আল্লাহর কাছে দোআ করতে থাকা।

যখন যিয়ারতের সুযোগ হবে তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে সালাত ও সালাম নিবেদনান্তে নিজের জন্য ইস্তেগফার করবে এবং তাঁর দরবারে ইস্তেগফারের জন্য আবেদন জানাবে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ○

"তারা যখন নিজের ক্ষতি করে বসেছে তখন যদি আপনার খেদমতে হাজির হয়ে ইস্তেগফার করত এবং রাসূলও তাদের জন্য ইস্তেগফার করতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে তৌবা কবুলকারী এবং দয়াশীল পেত।"

যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওজা শরীফে জীবিত আছেন তাই এ আয়াতে জীবদ্দশার ন্যায় ওফাতের পরও তাঁর রাওজা মুবারকে হাজির হয়ে ইস্তেগফার করলে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ইস্তেগফার করার দরখাস্ত করলে এমতাবস্থায় তৌবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।

রওযা মুবারক যিয়ারতের ফযীলত

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন—

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ وَجَبَتْ لَهٗ شَفَاعَتِىْ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার কবর যিয়ারত করবে তারজন্য আমার শাফায়াত ওয়াজেব হয়ে যাবে।"

হযরত আনাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন—

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِىْ فِى الْمَدِيْنَةِ مُحْتَسِبًا كَانَ فِىْ جِوَارِىْ وَكُنْتُ لَهٗ شَفِيْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি মদীনায় সওয়াবের নিয়তে আমার কবর যিয়ারত করবে সে আমার যিম্মায় এসে যাবে এবং কেয়ামতের দিন আমি তারজন্য শাফায়াত করব।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) হতে বর্ণিত—

مَنْ زَارَنِىْ بَعْدَ مَوْتِىْ فَكَاَنَّمَا زَارَنِىْ فِىْ حَيَاتِىْ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে আমার ইন্তিকালের পর আমার কবর যিয়ারত করল সে যেন জীবিতাবস্থায় আমার যিয়ারত করল।"

রওযা মুবারক যিয়ারত না করার জুলুম

এক হাদীসে আছে—

مَنْ لَّمْ يَزُرْ قَبْرِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করে নাই, সে আমার প্রতি জুলুম করেছে।"

অপর এক হাদীসে আছে—

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِىْ فَقَدْ جَفَانِىْ

"যে বায়তুল্লাহর হজ্জ করল আর কবর যিয়ারত করল না, সে আমার প্রতি জুলুম করল।"

উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা রাওজা মুবারকের যিয়ারত অপরিহার্য বলে প্রমাণিত হয়। তাই বহু উলামা ও মাশায়েখ রাওজা মুবারকের যিয়ারতকে ওয়াজেব বলেন।

ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে উল্লেখ করা হয়েছে—"আমাদের মাশায়েখগণ বলেন, এটা অর্থাৎ রাওজা মুবারকের যিয়ারত উত্তম মুস্তাহাব।" আর মানাসেকে ফারেসী ও শরহে মুখতার নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এটা সামর্থ্যবানের জন্য ওয়াজেবের কাছাকাছি।"

দুররে মুখতারে উল্লেখ আছে—"রাওজা মুবারকের যিয়ারত মুস্তাহাব বরং সামর্থ্যবানের উপর ওয়াজেব।"

রওযা মুবারক যিয়ারতের বিধান

আল্লামা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী (রহঃ) সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী আলেমের অভিমত রাওজা মুবারকের যিয়ারত ওয়াজেব বলে উল্লেখ করেছেন। আর

যারা মুস্তাহাবের অভিমত উল্লেখ করেছেন তাদের কথা কঠোরভাবে রদ করেছেন।

তিনি বলেন—"অতঃপর আমি তাদের কথা রদ করে কি অপরাধ করলাম যারা অধিকাংশ হানাফী আলেমের অভিমত রাওজা মুবারকের যিয়ারত শুধু মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন? অথচ অধিকাংশ আলেমই এটা ওয়াজেবের কাছাকাছি হওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, আর যা ওয়াজেবের কাছাকাছি তা ওয়াজেবতুল্য।"

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

সমাপ্ত